অন্ত্য-লীলা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃপাগুণৈর্যঃ সুগৃহান্ধকূপা-
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ ১
এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানারঙ্গে॥২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

সুগৃহান্ধকূপাৎ শোভনাৎ গৃহান্ধকূপাৎ। ভঙ্গ্যা যে কৃপারূপগুণা তৈঃ। ভঙ্গ্যা ইতি রাত্রিশেষে শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য-মন্তঃপ্রেরণয়া তদ্গৃহং যাপয়িত্বাচার্য্যেণসহ তদ্গৃহগমনায় কিঞ্চিৎ প্রদেশং শ্রীরঘুনাথদাসং নীত্বা তস্মাৎ তস্য পলায়নং ইত্যেবংরূপয়া ভঙ্গ্যা। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ (যিনি) কৃপাগুণৈঃ (কৃপারূপ রজ্জুদ্বারা) সুগৃহান্ধকূপাৎ (সুশোভন গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে) রঘুনাথদাসং (শ্রীরঘুনাথদাসকে) ভঙ্গ্যা (ভঙ্গীপূর্ব্বক—চাতুরীপূর্ব্বক) উদ্ধৃত্য (উদ্ধার করিয়া) স্বরূপে (স্বরূপ-দামোদরের হস্তে) ন্যস্য (অর্পণ করিয়া) অন্তরঙ্গং (স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত) বিদধে (করিয়াছিলেন), অমুং (সেই) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে) প্রপদ্যে (আশ্রয় করি)।

অনুবাদ। যিনি কৃপারূপ রজ্জুদ্বারা সুশোভন-গৃহরূপ অন্ধকূপ হইতে শ্রীরঘুনাথদাসকে চাতুরীপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া স্বরূপ-দামোদরের হস্তে অর্পণ করতঃ স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আমি শরণাগত হইলাম। ১

কৃপাগুণৈঃ—কৃপারূপ গুণ (রজ্জু)-দ্বারা; **সুগৃহান্ধকূপাৎ**—সু (উত্তম, সুশোভন) গৃহরূপ অন্ধকূপ (অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপ) হইতে শ্রীল রঘুনাথদাসকে **উদ্ধৃত্য**—উদ্ধার করিয়া; অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর কূপ হইতে যেমন রজ্জু-দ্বারা কোনও জিনিসকে তুলিয়া আনা হয়, তদ্রূপ সংসার-রূপ অন্ধকূপ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাদ্বারা রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। "সুগৃহ" বলার হেতু এই যে, রঘুনাথ-দাসের পিতা-জ্যেঠা ছিলেন সপ্তগ্রামের রাজা—বিশেষ সম্পন্ন ব্যক্তি। রঘুনাথ ছিলেন তাঁহাদের বিপুলসম্পত্তির একাত্র ভাবী অধিকারী। সুরম্য অট্টালিকাদিতে তাঁহার বাসস্থান ছিল; তাই তাঁহার গৃহকে সুগৃহ বলা হইয়াছে। ইহাকে অন্ধকূপ বলার হেতু এই যে, অন্ধকারময় কূপে পতিত হইলে লোক যেমন নিজের চেষ্টায় উঠিতে পারে না, সেখানে থাকিয়া কেবল মশা, মাছি, জোক, পোকাদির দংশন-যন্ত্রণাই ভোগ করে, একটু আলোকের রশ্মিও দেখিতে পায় না, তদ্রূপ বিষয়-সম্পত্তির ও মায়িক ভোগ্যবস্তুর মোহে পড়িয়াও লোক

যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখ-ভয়ে ॥ ৩
উৎকট বিয়োগদুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥ ৪
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহবেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনারূপ অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে; কখনও ভগবদুন্মুখতার ক্ষীণ রশ্মিও দেখিতে পায় না, সংসার-কূপে পড়িয়া কেবল কাম-ক্রোধাদির এবং ত্রিতাপ-জ্বালাদির যন্ত্রণাই সহ্য করিয়া থাকে, কোনও মহাপুরুষের কৃপা বা ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত জীব নিজের চেষ্টায় কখনও এই সংসারকূপ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। "মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥ ২।২২।৩২॥" এতাদৃশ সংসার-কূপ হইতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কৃপা করিয়া রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিলেন। কিরূপে উদ্ধার করিলেন? **ভঙ্গ্যা**—ভঙ্গীপূর্ব্বক, চাতুরীপূর্ব্বক। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চাতুরীটী এই:—এই পরিচ্ছেদে রঘুনাথদাস গোস্বামীর বিবরণ বর্ণিত হইবে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিকটে পলাইয়া যাইবার ভয়ে তাঁহার পিতা ও জ্যেঠা সর্ব্বদাই রঘুনাথের সঙ্গে প্রহরী রাখিতেন। এক রাত্রিতে প্রহরীবেষ্টিত রঘুনাথ বাহিরে দুর্গামণ্ডপে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় শেষরাত্রিতে তাঁহার গুরুদেব শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বাহিরে আনিলেন এবং নিজের ঠাকুর-সেবার পাচক-ব্রাহ্মণ পলাইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাকে সাধিয়া আনিবার নিমিত্ত রঘুনাথকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। কতদূর যাওয়ার পরে রঘুনাথ একাকীই পাচকের নিকটে যাইতে পারিবে বলিয়া আচার্য্যকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন; আচার্য্যের আজ্ঞা লইয়া রঘুনাথ অগ্রসর হইলেন, আচার্য্যও বাড়ী চলিয়া গেলেন। রঘুনাথ আর গৃহে ফিরেন নাই, পলাইয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। এই ব্যাপারে প্রভুর চাতুরী এই যে, তিনিই অন্তঃকরণে প্রেরণাদ্বারা যদুনন্দন আচার্য্যকে রাত্রিশেষে রঘুনাথের নিকটে পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে ঘরের বাহির করিয়া কিয়দ্দূর একসঙ্গে যাইয়া রঘুনাথের কথামত বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়ার নিমিত্ত আচার্য্যের প্রবৃত্তি জন্মাইলেন। এই সুযোগ পাইয়াই রঘুনাথ গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। যাহাহউক, এইরূপ চাতুরীপূর্ব্বক রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিয়া প্রভু তাঁহাকে স্বরূপে—স্বরূপ-দামোদরে, স্বরূপ-দামোদরগোস্বামীর হস্তে অর্পণ করিলেন এবং এইরূপে স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গ ও উপদেশের প্রভাবে রঘুনাথকে তিনি স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত করিয়া লইলেন। এমন কৃপালু যে শ্রীমন্‌মহা-প্রভু, গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন—তাঁহার কৃপায় যেন প্রারব্ধ-কার্য্যে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, ইহাই যেন তাঁহার অন্তর্নিহিত বাসনা। এই শ্লোকে গ্রন্থকার ভঙ্গীক্রমে এই পরিচ্ছেদে বর্ণনীয় বিষয়েরও ইঙ্গিত দিলেন।

৩। **যদ্যপি**—যদিও। **অন্তরে**—অন্তঃকরণে। **কৃষ্ণবিয়োগ**—শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত দুঃখ। **বাধয়ে**—বাধা দেয়; কষ্ট দেয়। **ভক্ত-দুঃখভয়ে**—প্রভুর অন্তরের দুঃখের কথা শুনিলে ভক্তদেরও অত্যন্ত দুঃখ হইবে, এই আশঙ্কায় প্রভু নিজের দুঃখের কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই।

৪। **উৎকট**—অসহ্য, অসম্বরণীয়; যাহা কিছুতেই সামলাইয়া রাখা যায় না। **উৎকট বিয়োগ-দুঃখ ইত্যাদি**—প্রভুর অন্তঃকরণে কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখ যখন এত অসহ্য হইয়া উঠে যে, তাহা আর কিছুতেই সামলাইয়া রাখিতে পারেন না, তখন তাহা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িত। এইরূপে অন্তরের অসহ্য দুঃখ যখন বাহির হইয়া পড়িত, তাঁহার তখনকার কাতরতা অবর্ণনীয়, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। **বৈকল্য**—বিকলতা, কাতরতা।

৫। **রামানন্দের কৃষ্ণকথা** ইত্যাদি—কৃষ্ণবিরহ-বেদনায় প্রভু যখন অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িতেন, তখন রামানন্দরায় প্রভুর চিত্তের ভাবানুকূল কৃষ্ণকথা শুনাইতেন এবং স্বরূপদামোদরও তখন ভাবানুকূল গান গাহিতেন। তাহাতেই প্রভুর চিত্তে সান্ত্বনা জন্মিত।

দিনে প্রভু নানাসঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাঢ়ে প্রভুর বিরহবেদনা ॥ ৬
তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুইজনা।
কৃষ্ণরসশ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা ॥ ৭
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখদানহেতু তৈছে রামরায় ॥ ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬। **দিনে প্রভু** ইত্যাদি—দিবাভাগে নানাবিধ লোক প্রভুর দর্শনে আসিত; তাহাদের সঙ্গে নানাবিধ কথায় ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া প্রভু একটু অন্যমনস্ক থাকিতেন, শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দুঃখ তখন তাঁহাকে তত অধীর করিতে পারিত না। **রাত্রিকালে** ইত্যাদি—কিন্তু রাত্রিকালে প্রভু একাকী থাকিতেন বলিয়া একমাত্র কৃষ্ণবিরহ-দুঃখেই তাঁহার সমস্ত চিত্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকিত, তাই ঐ সময়ে তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণাও খুব বেশী হইত।

৭। **তাঁর সুখ হেতু**—প্রভুর সুখের নিমিত্ত; কৃষ্ণকথা ও গান শুনাইয়া প্রভুর বিরহ-যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিবার নিমিত্ত।

রহে—রাত্রিতে প্রভুর নিকটে থাকেন।

দুইজনা—স্বরূপদামোদর ও রায়-রামানন্দ।

কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে—কৃষ্ণকথা-রসময়-শ্লোক ও গীত। স্বরূপদামোদর গীত গাহিতেন, আর রামানন্দ কৃষ্ণকথা শুনাইতেন।

৮। স্বরূপদামোদর ও রায়-রামানন্দ, এই দুইজনের কে কি ভাবে কৃষ্ণবিরহ-কাতর শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে সান্ত্বনা দিতেন, তাহা "সুবল যৈছে" হইতে "মহাপ্রভুর প্রাণ" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে বলিতেছেন।

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন ঘটাইয়া দিয়া সুবল যেরূপে রাধা-বিরহ-কাতর শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান করিতেন, রামানন্দরায়ও সেই ভাবে শ্রীশ্রীগৌরের সুখ-বিধান করিতেন।

যৈছে—যেভাবে, যেরূপে। **পূর্ব্বে**—পূর্ব্ব-লীলায়, ব্রজলীলায়। **তৈছে**—তদ্রূপ, সেইভাবে।

এই পয়ারে দুইটী বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন। প্রথমতঃ, রায়রামানন্দকে সুবলের ভাবাপন্ন বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে, রামানন্দরায়ে ব্রজের প্রিয়নর্ম্মসখা অর্জ্জুন, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন, ললিতা ও অর্জ্জুনীয়া নাম্নী গোপী মিলিত হইয়া আছেন। রামানন্দ যে ব্রজলীলায় সুবল ছিলেন, গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায় তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়না। গণোদ্দেশ-দীপিকার মতে গৌরীদাস-পণ্ডিতই ব্রজলীলায় সুবল ছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বাক্যও কিছুতেই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না; তাহাতে আমাদের মনে হয়, রামানন্দরায়ে অর্জ্জুনাদি যেমন মিলিত হইয়াছেন, সুবলও তদ্রূপ মিলিত হইয়াছেন; গৌরীদাস-পণ্ডিত সুবল হইলেও রামানন্দেও সুবলের ভাব কিছু আছে। ব্রজলীলার অনেকের ভাব গৌরলীলায় একজনেতে, ব্রজলীলার একজনের ভাবও গৌরলীলায় বহুজনে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আবার শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামিপাদের মতে, ব্রজের বিশাখা-সখীই "রায়রামানন্দতয়া বিখ্যাতোঽভূৎ কলৌ যুগে—কলিতে রায়রামানন্দরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন।" আজকাল যে সকল মহানুভব বৈষ্ণব মধুর-ভাবের উপাসক, তাঁহাদের অনেকেই বোধ হয় এই মতাবলম্বী।

দ্বিতীয়তঃ, এই পয়ারে রামানন্দরায়কে যেমন সুবলের ভাবাপন্ন বলা হইয়াছে, তেমনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকেও শ্রীকৃষ্ণভাবাপন্ন বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু নীলাচলে গম্ভীরা-লীলার যে সকল উক্তি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের কোনওটীতেই শ্রীশ্রীগৌরের শ্রীকৃষ্ণভাব প্রকটিত আছে বলিয়া মনে হয়না। আবার শ্রীরাধার ভাবে প্রলাপোক্তির সময়েও স্বরূপদামোদরের সঙ্গে রায়রামানন্দকেও প্রভুর সান্ত্বনা দান করিতে দেখা যায়।

এই সকল বিষয়ের সমাধান বোধ হয় এইরূপ :—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ। শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়াই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন; আবার জীবকে ভজন শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত তিনি ভক্তভাবও

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অঙ্গীকার করিয়াছেন। তথাপি, নবদ্বীপ-লীলায় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-ভাব যে একেবারে অপ্রকট, তাহা নহে। শ্রীমন্-মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণভাবে তৈর্থিকব্রাহ্মণাদির সেবায় দাস্যরস, রামাই, সুন্দরানন্দ, গৌরীদাস, অভিরামাদির সঙ্গে সখ্যরস, শ্রীশচীমাতা ও মিশ্রপুরন্দরের সঙ্গে বাৎসল্যরস এবং গদাধরাদি সহচরগণের সঙ্গে সুরধুনীতে নৌকাবিলাসাদিতে মধুর-রসও আস্বাদন করিয়াছেন। এসম্বন্ধে মহাজনোক্তিই প্রমাণ। গোষ্ঠলীলার গৌরচন্দ্রে দেখিতে পাওয়া যায় :—"আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল। ধবলী সাঙলী বলি সঘনে ডাকিল॥ শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি। হৈ হৈ বলিয়া গোরা ঘুরায় পাঁচনী॥" আবার,—"গৌর কিশোর, পূরব-রসে গরগর, মনে ভেল গোষ্ঠ-বিহার। দাম শ্রীদাম, সুবল বলি ডাকই, নয়নে গলয়ে জলধার॥ বেত্র বিশাল, সাজ লেই যাজন, যায়ব ভাণ্ডীর সমীপ। গৌরীদাস, সাজ করি তৈখনে, গৌর নিকটে উপনীত॥" শিঙ্গা-বেণু-মুরলী-বেত্র-বিশাল-সাজে সজ্জিত হইয়া দাম-শ্রীদাম-সুবলাদিকে সঙ্গে লইয়া হৈ হৈ রবে ধবলী-শ্যামলী-আদি গাভীগণকে ফিরাইয়া শ্রীকৃষ্ণই ভাণ্ডীরাদি বন-সমীপে গোচারণে গিয়া থাকেন—শ্রীরাধিকা এভাবে গোচারণে যায়েন না। তাই স্পষ্টই বুঝা যায়, ঐ সমস্ত পদে গৌরের শ্রীকৃষ্ণভাবই প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীনিমাইচাঁদের মৃদ্ভক্ষণ, কালোহাঁড়ীর স্তূপে উপবেশন, গৃহের জিনিষ-পত্রের অপচয়, গঙ্গাঘাটাদিতে দুরন্তপনার দরুণ মিশ্রপুরন্দরকর্তৃক শ্রীনিমাইয়ের-শাসন-প্রভৃতি বাল্যলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণভাবে বাৎসল্য-রসাস্বাদনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণভাবে প্রভুর মধুর-রসাস্বাদনের দৃষ্টান্তও মহাজনের পদে দেখিতে পাওয়া যায়। নৌকা-বিলাসের গৌরচন্দ্রে :—"না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন্ ভাব মনে। সুরধুনী-তীরে গেলা সহচর-সনে॥ প্রিয় গদাধর-আদি সঙ্গেতে করিয়া। নৌকায় চড়িল গৌর প্রেমাবেশ হৈয়া॥ আপনি কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকাখানি। ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি॥" আবার, "আরে মোর গৌরাঙ্গ নায়। সুরধুনী মাঝে যাইয়া, নবীন নাবিক হৈয়া, সহচর মেলিয়া খেলায়॥ প্রিয়-গদাধর-সঙ্গে, পূরব রভস রঙ্গে, নৌকায় বসিয়া করে কেলি। ডুব ডুব করে না, বহায় বিষম বা, দেখি হাসে গোরা-বনমালী॥" এই শেষোক্তপদে প্রভুকে "গোরা-বনমালী" বলাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রভু কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন ; গোরা-বনমালী গোরারূপ বনমালী (কৃষ্ণ), বনমালীর (কৃষ্ণের) ভাবে আবিষ্ট গোরা। বিশেষতঃ, ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণই যমুনাগর্ভে নৌকা ভাসাইয়া "আপনি কাণ্ডারী হইয়া" নৌকা বাহিয়াছিলেন" এবং "বিষম বাতাস বহাইয়া নৌকা খানিকে ডুব ডুব করিয়াছিলেন।" শ্রীমতীরাধিকা এরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া কেনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

তারপর, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগোচিত গৌরচন্দ্রে আরও পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায় :—"আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী॥ রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে। সুরধুনী-ধারা বহে অরুণ নয়নে॥ খেনে খেনে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়। রাধা নাম বলি খেনে খেনে মুরুছায়॥"—শ্রীরাধার বিরহে কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ রাধানাম জপ করিতেন, রাধা রাধা বলিয়া কান্দিতেন ও ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঠিক সেই ভাবই উক্ত পদে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

উপরে যে সমস্ত মহাজনী পদ উল্লিখিত হইল, তৎসমস্তই শ্রীনবদ্বীপ-লীলার পদ ; নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যে শ্রীকৃষ্ণ-ভাবও উদিত হইত, উক্তপদ সমূহে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। সেই প্রভুই যখন নীলাচলে গিয়াছেন, তখন নীলাচলেও যে সময় সময় তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণভাব স্ফুরিত হইত, ইহা মনে করা অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না ; কারণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপতঃ তো শ্রীকৃষ্ণই ; শ্রীকৃষ্ণের ভাব তাঁহার স্বরূপগত ভাব। তিনি একাধারে বিষয় এবং আশ্রয় উভয়ই। অনুকূল উদ্দীপনাদির প্রভাবে সময় সময় নীলাচলেও তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভাব (বিষয়ের ভাব) স্ফুরিত হওয়া অসম্ভব নহে। আলোচ্য পয়ারের ধ্বনিতেও তাহাই বুঝা যাইতেছে।

পূর্ব্ব যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপগোসাঞি রাখে মহাপ্রভুর প্রাণ॥ ৯
এই দুইজনার সৌভাগ্য কহনে না যায়।
'প্রভুর অন্তরঙ্গ' করি যাঁরে লোকে গায়॥ ১০
এইমত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ।
এবে শুন ভক্তগণ! রঘুনাথ মিলন॥ ১১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রশ্ন হইতে পারে, নীলাচলেও যদি সময় সময় প্রভুর শ্রীকৃষ্ণভাব স্ফুরিত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে কবিরাজ-গোস্বামী তাহার উল্লেখ করিলেন না কেন? উত্তর—শ্রীরাধার ভাবে প্রভুর চিত্ত এতই গাঢ়রূপে আবিষ্ট হইত যে, শ্রীরাধা-ভাবেরই প্রাধান্য অধিকাংশ সময়ে থাকিত; শ্রীকৃষ্ণভাব সাময়িক ভাবে মাত্র কখনও কখনও স্ফুরিত হইত। রাধাভাবোচিত লীলাদিই প্রভুর মুখ্য আস্বাদ্য বলিয়া এবং প্রভুর দিব্যোন্মাদ-লীলায় রাধাভাবই সম্যক্ প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামী দিব্যোন্মাদজনিত প্রলাপোক্তিরই সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। প্রভুর এই দিব্যোন্মাদ-লীলা রাগানুগামার্গীয় মধুর-ভাবের উপাসকের উপসনার অনুকূল বলিয়াও হয়তো সাধকের প্রতি কৃপা করিয়া কবিরাজ-গোস্বামী তাহাই সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। তিনি নিজেও হয়ত রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত গৌরের আনুগত্যে ঐ লীলায় আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া প্রভুর কৃষ্ণভাবোচিত লীলার প্রতি তাঁহার তত অনুসন্ধানও ছিল না। আলোচ্য পয়ারে ভঙ্গীতে তাহার ইঙ্গিতমাত্র করিয়াছেন।

যাহা হউক, উক্ত আলোচনার সঙ্গে শ্রীচরিতামৃতের—"সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়। গৌরসুখদানহেতু তৈছে রামরায়॥"—এই পয়ারটী মিলাইয়া অর্থ করিলে এই পয়ারের মর্ম্ম এইরূপ হইবে বলিয়া মনে হয়:—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের ভাবে যখন রাধা-বিরহে কাতর হইতেন, তখন রামানন্দরায় সুবলের ভাবে তাঁহাকে সান্ত্বনাদি দিয়া আশ্বস্ত করিতেন। কিন্তু শ্রীরাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তিনি যখন অধীর হইয়া পড়িতেন, তখন রামানন্দ বিশাখার ভাবেই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন।"

শারদীয়-মহারাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলে তাঁহার বিরহে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি চিন্তা করিতে করিতে কোনও কোনও গোপী যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণবৎ আচরণ বা শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন, রাধাভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুও কৃষ্ণবিরহে অধীর হইয়া তদ্রূপ কৃষ্ণভাবের আবেশে পূর্ব্বোল্লিখিত নৌবিলাসাদি লীলা করিয়াছিলেন—এইরূপ মনে করিয়াও কান্তাভাবের উপাসকগণ পূর্ব্বোক্ত লীলাদি আস্বাদন করিতে পারেন। ২।২৩।৪১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯। পূর্ব্বপয়ারে রামানন্দ রায়ের ভাবের কথা বলিয়া এই পয়ারে স্বরূপ-দামোদরের ভাবের কথা বলিতেছেন।

ব্রজলীলায় কৃষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধার পক্ষে তাঁহার প্রিয়সখী ললিতাই যেমন প্রধান সহায়-স্বরূপিণী ছিলেন, তদ্রূপ গৌরলীলায়ও স্বরূপ-দামোরই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর রাধাভাবে কৃষ্ণবিরহ-কাতরতার সময়ে প্রভুর প্রধান সহায়-স্বরূপ ছিলেন—ললিতা শ্রীরাধাকে যে ভাবে সান্ত্বনাদি দিতেন, স্বরূপ-দামোদরও সেইভাবে কৃষ্ণবিরহ-কাতর প্রভুর সান্ত্বনা বিধান করিতেন।

স্বরূপ-দামোদর যে ব্রজলীলায় ললিতা ছিলেন, এই পয়ারে তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এজন্যই বোধ হয় শ্রীল ধ্যানচন্দ্র গোস্বামিপাদও লিখিয়াছেন, "শ্রীললিতা স্বরূপ-দামোদরতাং প্রাপ্তা গৌর-রসে তু যা॥—ললিতা গৌররসে নিমগ্না হইয়া স্বরূপ-দামোদরতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।" কিন্তু গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকার মতে ব্রজের বিশাখাই গৌর-লীলায় স্বরূপ-দামোদর হইয়াছেন। "যা বিশাখা ব্রজে পুরা। সাদ্য স্বরূপগোস্বামী তত্তদ্‌ভাব-বিলাসবান্॥" ইহাতে বুঝা যায়, স্বরূপদামোদরে বিশাখার ভাবও কিছু ছিল।

১০। **এই দুইজনার**—স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দের। **প্রভুর অন্তরঙ্গ** ইত্যাদি—লোকে এই দুই জনকে প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

১১। **বিহরে**—বিহার করেন, লীলা করেন। **রঘুনাথ-মিলন**—যে ভাবে রঘুনাথদাস মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে মিলিত হইয়াছেন, তাহা।

পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তারে শিক্ষাইলা ॥ ১২
প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজঘরে যায়।
মর্কটবৈরাগ্য ছাড়ি হৈলা বিষয়ীর প্রায় ॥ ১৩
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্বকর্ম্ম।
দেখিয়া ত মাতা-পিতার আনন্দিত মন ॥ ১৪
'মথুরা হইতে প্রভু আইলা' বার্ত্তা যবে পাইল।
প্রভুপাশে চলিবারে উদ্‌যোগ করিল ॥ ১৫
হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম-মুলুকের সে হয় চৌধুরী ॥ ১৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২। **পূর্ব্বে শান্তিপুরে**—মহাপ্রভু গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাওয়ার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তখন শান্তিপুরে গিয়াছিলেন; শান্তিপুর হইতে যাত্রা করিয়া কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত যাইয়া পুনরায় শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন; এইবার প্রভু দশদিন শান্তিপুরে ছিলেন। এই সময়ে রঘুনাথদাস প্রভুর চরণ দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। **তারে শিখাইলা**—প্রভু তখন রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন—"স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব-সিন্ধুকূল॥ মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥ অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহে লোক-ব্যবহার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবে উদ্ধার॥ ২।১৬।২৩৫-৩৭॥"

১৩। **তেঁহো**—রঘুনাথ দাস।

মর্কট বৈরাগ্য—মর্কটের ছায় বহির্বৈরাগ্য। ৩।২।১১৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। যাহাদের ভিতরে বিষয়াসক্তি, কিন্তু বাহিরে বৈরাগ্যের বেশ, তাহাদের বৈরাগ্যকেই মর্কট-বৈরাগ্য বলে। রঘুনাথের বৈরাগ্য বাস্তবিক তদ্রূপ ছিল না; তাঁহার চিত্তে ভোগাসক্তি ছিল না; প্রভু তাঁহাকে কেবল বাহ্য বৈরাগ্য ত্যাগ করিতেই বলিয়াছেন, অর্থাৎ প্রভু বলিলেন—বাহিরে এমন কোন আচরণ দেখাইবে না, যাহা দেখিয়া লোকে বুঝিতে পারে যে, ভিতরে তোমার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে।

বিষয়ীর প্রায়—বিষয়ীর মতন। রঘুনাথ "বিষয়ীর মতন" হইলেন, কিন্তু "বিষয়ী" হইলেন না; তিনি প্রভুর উপদেশানুসারে, অনাসক্তভাবে সমস্ত বিষয়-কর্ম্ম করিতে লাগিলেন; তাহাতে লোকে মনে করিল, তিনি আবার বিষয়ে মন দিয়াছেন, বিষয়ী হইয়াছেন; বস্তুতঃ কিন্তু তিনি মোটেই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন নাই, বাহিরে যন্ত্রের মত কাজ-কর্ম্ম করিয়া যাইতেছিলেন মাত্র; তাঁর মন ছিল সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্য-চরণে।

১৪। **আনন্দিত মন**—পুত্র বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়াছেন, সুতরাং আর গৃহত্যাগের সম্ভাবনা নাই, ইত্যাদি মনে করিয়া পিতামাতার আনন্দ হইল।

১৫। **মথুরা হইতে প্রভু আইলা**—প্রভু মথুরা হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, এই সংবাদ শুনিয়া। প্রভু শান্তিপুরে রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন, "আমি—বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে। তবে তুমি আমাপাশ আসিহ কোন ছলে॥ ২।১৬।২৩৮॥" এই আশায় বুক বাঁধিয়া রঘুনাথ এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন যখন শুনিলেন, প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখনই প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

১৬। **মুলুক**—কতকগুলি পরগণা লইয়া একটা মুলুক হয়।

সপ্তগ্রাম-মুলুক—রঘুনাথের পিতা-জ্যেঠা হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস সপ্তগ্রামে বাস করিতেন; সপ্তগ্রামে থাকিয়া তাঁহারা যে মুলুক শাসন করিতেন, তাহার নাম ছিল "সপ্তগ্রাম-মুলুক।" সপ্তগ্রাম-মুলুক সাতটা গ্রামের সমষ্টিমাত্র ছিল না। বর্ত্তমান হুগলী, হাওড়া, কলিকাতা ও চব্বিশপরগণা জেলা এবং বর্দ্ধমান-জেলার কিয়দংশ এই সপ্তগ্রাম-মুলুকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোগল-সম্রাট্ আকবরের সময়ে রাজস্ব-মন্ত্রী টোডরমল্লের সেরেস্তায় সপ্তগ্রাম একটী রাজস্ব-সরকারে ভুক্ত ছিল।

হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া॥ ১৭
বার লক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বিশলক্ষ।
সেই তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥ ১৮
রাজঘরে কৈফিতি দিয়া উজীর আনিল।
হিরণ্যমজুমদার পলাইল, রঘুনাথেরে বান্ধিল॥ ১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মুসলমান রাজত্বের সময়ে সপ্তগ্রাম মুসলমান-শাসন-কর্ত্তাদের রাজধানী ছিল; এস্থানে টাক্‌শালও ছিল, তাহাতে মুদ্রা প্রস্তুত হইত। এই মুসলমান-শাসনকর্ত্তারা নামে মাত্র মোগল-সম্রাট্‌দিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন, প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহারা সম্রাট্‌কে গ্রাহ্যও করিতেন না, সম্রাটের সরকারে রীতিমত রাজস্বও আদায় করিতেন না। ফলতঃ তাঁহারাই সপ্তগ্রামের প্রকৃত অধীশ্বর ছিলেন।

এই সময়ে ঐ অঞ্চলে একটী কায়স্থ-পরিবার অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন; হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস নামে দুই সহোদর এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্পকাল-মধ্যেই দুই সহোদর রাজকার্য্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের অত্যাচারে হিন্দুদের বিশেষ কষ্ট হইতেছে দেখিরা ইঁহারা সপ্তগ্রাম-মুলুক মোক্তাসূত্রে বন্দোবস্ত পাইবার নিমিত্ত রাজ-দরবারে দরখাস্ত করেন। মোক্তা—কতকটা ইজাড়া বন্দোবস্তের মত; যাঁহারা মোক্তা-সূত্রে কোনও মহল বন্দোবস্ত নিতেন, রাজসরকারে একটা নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক জমা দিতে পারিলেই তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইতেন; নির্দ্দিষ্ট জমা ব্যতীত রাজসরকারের সহিত তাঁহাদের আর কোনও সম্বন্ধই থাকিত না। তাঁহারা মোক্তা-মহাল যথেচ্ছভাবে শাসন করিতে পারিতেন; তাহাতে রাজা কোনও আপত্তি করিতেন না।

যাহা হউক, হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস মোক্তা-বন্দোবস্তের দরখাস্ত করিলে রাজা বিবেচনা করিলেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান-শাসনকর্ত্তারা তো এক পয়সাও রাজস্ব দেয় না, তাহারা বিদ্রোহী তুল্য। হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের নিকট হইতে যদি প্রতিবর্ষে একটা নির্দ্দিষ্ট জমা পাওয়া যায়, তাহাতে লাভেরই কথা। ফলতঃ তাঁহাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হইল; বারলক্ষ টাকা বার্ষিক খাজনায় তাঁহারা সপ্তগ্রাম-মুলুক বন্দোবস্ত পাইলেন। ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান-শাসন কর্ত্তাদের মুলুকের উপর আধিপত্য নষ্ট হইল; তাঁহারা এই হিন্দু-পরিবারের চিরশত্রু হইয়া উঠিলেন।

সপ্তগ্রাম বর্ত্তমান কলিকাতা হইতে বেশী দূরে নহে; ত্রিশবিঘা রেলওয়ে-ষ্টেশন কলিকাতা হইতে ২৭ মাইল দূরে; সপ্তগ্রাম ত্রিশবিঘার অতি নিকটে।

সে হয় চৌধুরী—ঐ ম্লেচ্ছ অধিকারী (পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান-শাসনকর্ত্তা) সপ্তগ্রামের একজন প্রধান ব্যক্তি; তিনিই হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম-মুলুকের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

(হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন দাসাদির ঐতিহাসিক বিবরণ শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রণীত "শ্রীমদ্দাসগোস্বামী" অবলম্বনে লিখিত)।

১৭। মোকতা—মোক্তা। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তার অধিকার গেল**—মুসলমান-চৌধুরীর আধিপত্য নষ্ট হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মরে সে দেখিয়া**—সপ্তগ্রাম-মুলুকে মুসলমান চৌধুরীর অধিকার নষ্ট হইল দেখিয়া চৌধুরী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন।

১৮। বার লক্ষ ইত্যাদি—হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস মুলুক হইতে বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করিতেন; কিন্তু রাজ-সরকারে মাত্র বার লক্ষ টাকা খাজানা দিতেন; আর বার্ষিক আটলক্ষ টাকা তাঁহাদের লাভ থাকিত।

সেই তুড়ুক—তুরস্ক-দেশীয় সেই মুসলমান চৌধুরী। **কিছু না পাঞা**—মুলুকের আয় হইতে কিছু মাত্র না পাইয়া। **হৈল প্রতিপক্ষ**—নিজের স্বার্থ নষ্ট হওয়ায় হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন।

১৯। রাজঘরে—রাজার দরবারে। অন্ত্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন-দাস গৌড়েশ্বর নবাবের সরকারেই বারলক্ষ টাকা খাজনা দিতেন। "গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম এক ব্রাহ্মণ। মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা প্রধান॥ গৌড়ে রহে পাৎশাহা-আগে আরিন্দা গিরি করে। বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাৎশার ঠাঞি

প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা—।
বাপ-জ্যেঠা আনহ, নহে পাইবি যাতনা ॥ ২০
মারিতে আনয়ে যদি দেখে রঘুনাথে।
মন ফিরি যায়, তাতে না পারে মারিতে। ২১
বিশেষে কায়স্থবুদ্ধি অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জ-গর্জ্জ করে, মারিতে সভয় অন্তর ॥২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভরে ॥ ৩।৩।১৭৮-৭৯ ॥" সুতরাং এস্থলে রাজঘর-শব্দে গৌড়েশ্বর নবাবের দরবারই বুঝিতে হইবে। নবাবের নিকট হইতেই হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস সপ্তগ্রাম-মুলুক মোকতা করিয়া নিয়াছেন। **কৈফিতি দিয়া**—কৈফিয়ৎ দিয়া; মুসলমান-চৌধুরী নবাব-দরবারে জানাইলেন যে, হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস মুলুক হইতে বিশলক্ষ টাকা আদায় করেন, কিন্তু রাজ-সরকারে মাত্র বারলক্ষ টাকা রাজস্ব দেন; এই রাজস্ব অতি অল্প; রাজস্ব আরও বেশী হওয়া উচিত। হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের অনিষ্টসাধনের নিমিত্তই জাতক্রোধ মুসলমান-চৌধুরী এরূপ করিয়াছিলেন। **উজীর**—নবাবের প্রধান কর্ম্মচারী। **হিরণ্যমজুমদার পলাইল**—মুসলমান-চৌধুরীর কুচক্রে যখন সপ্তগ্রামে উজীর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ভয়ে হিরণ্যদাস পলায়ন করিলেন। ঐ সঙ্গে সম্ভবতঃ গোবর্দ্ধন দাসও পলাইয়াছিলেন; নচেৎ গোবর্দ্ধনদাসকে না বাঁধিয়া উজীর যুবক রঘুনাথকে বান্ধিয়া নিবেন কেন? পরবর্ত্তী পয়ারের "বাপ-জ্যেঠা আন" এইরূপ উক্তিও ইহার অনুকূল।

রঘুনাথেরে বান্ধিল—হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসকে না পাইয়া উজীর রঘুনাথদাসকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেলেন। রঘুনাথ-দাস গোবর্দ্ধন-দাসের একমাত্র পুত্র ছিলেন।

২০। উজীর রঘুনাথকে নিয়া সম্ভবতঃ কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন; তাঁহার পিতা ও জ্যেঠা কোথায় আছেন, বলিয়া দিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদিগকে আনিয়া দিবার নিমিত্ত সেইস্থানে পূর্ব্বোক্ত ম্লেচ্ছ-চৌধুরী প্রত্যহই তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পিতা-জ্যেঠাকে ধরিবার উপায় বলিয়া না দিলে তাঁহাকে যে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এরূপ ধমকও তিনি দিতে লাগিলেন। কিন্তু এসব তিরস্কার এবং ধমক সত্ত্বেও রঘুনাথ অবিচলিত রহিলেন; তিনি বোধ হয় অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্য-চরণারবিন্দই চিন্তা করিতেছিলেন।

পরবর্ত্তী ৩।৬।২৮-৩০ পয়ারের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়, সপ্তগ্রামের পূর্ব্বতন অধিকারী ম্লেচ্ছ-চৌধুরীই রঘুনাথদাসকে ভর্ৎসনাদি করিতেন এবং উৎপীড়নের ভয় দেখাইতেন। উজীর রঘুনাথের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ আচরণে বিরক্ত হইবেন না, এই ভরসা এই ম্লেচ্ছ চৌধুরীর ছিল; যেহেতু, তিনি উজীরের উদ্দেশ্যসিদ্ধির আনুকূল্যই করিতেছিলেন।

২১। রঘুনাথ পিতা-জ্যেঠার কোনও সংবাদ দিতেছেন না দেখিয়া ম্লেচ্ছ চৌধুরী মনে করিলেন, তাঁহাকে কোনওরূপ শারীরিক যন্ত্রণা (প্রহারাদি) দিলে সমস্ত কথা প্রকাশ করিবেন। এইরূপ মনে করিয়া তিনি রঘুনাথকে উৎপীড়ন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের নিকটে আনিলেন; কিন্তু রঘুনাথের ভক্তি-সমুজ্জ্বল ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিলে তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া যাইত, তিনি আর প্রহারাদির আদেশ দিতে পারিতেন না। **মন ফিরি যায়**—প্রহারাদি শারীরিক উৎপীড়নের প্রবৃত্তি দূর হইয়া যায়।

২২। রঘুনাথের মুখ দেখিলে ম্লেচ্ছ চৌধুরীর দয়া জন্মে; তাতে তাঁহাকে প্রহার করিবার নিমিত্ত আদেশ দিতে পারেন না। প্রহারের আদেশ না দেওয়ার আর একটী কারণও ছিল। তিনি কায়স্থ-জাতির কুটবুদ্ধিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন; রঘুনাথ কায়স্থ; বিশেষতঃ, তাঁহার পিতা-জ্যেঠা অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ ও জনপ্রিয় লোক ছিলেন। রঘুনাথের দেহের উপর কোনওরূপ অত্যাচার করিলে তাঁহার পিতা-জ্যেঠা ইহার প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে যদি একটা অনর্থের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই ভয়েও রঘুনাথকে প্রহারাদি করার আদেশ দিতে পারিতেন না; তাই কেবল মুখেই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেন, প্রহারাদির আদেশ দিতেন না।

কায়স্থ-বৃত্তি—কোন কোন গ্রন্থে "কায়স্থ-বুদ্ধি" পাঠ আছে। জাতিতে কায়স্থ বলিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাসের

তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়।
বিনতি করিয়া বোলে সেই ম্লেচ্ছ-পায়—॥ ২৩
আমার পিতা-জ্যেঠা হয় তোমার দুইভাই।
ভাই-ভাই কলহ করহ সর্ব্বথাই॥ ২৪
কভু কলহ কভু প্রীত, ইহার নিশ্চয় নাঞি।
কালি পুন তিনভাই হবে একঠাঞি॥ ২৫
আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক।
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক॥ ২৬
পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না জুয়ায়।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান জিন্দাপীর-প্রায়॥ ২৭
এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।
দাড়ি বাহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল॥ ২৮
ম্লেচ্ছ কহে—আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র।
আজি ছাড়াইমু তোমা করি এক সূত্র॥ ২৯
উজীরে কহিয়া রঘুনাথে ছোড়াইল।
প্রীত করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল—॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১।২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীরঘুনাথদাসকে কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "শ্রীরঘুনাথদাসো নাম গৌড়কায়স্থকুলাব্জভাস্করঃ পরমভাগবতঃ ইত্যাদি।" **অন্তরে**—মনে। **ডর**—ভয়।

২৩। নিজেকে অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিতে হইতেছে বলিয়া রঘুনাথের কোনও চিন্তা ছিল না; কিন্তু তাঁহার বিপদের আশঙ্কায় তাঁহার পিতা-জ্যেঠা হয়তো অনেক মনঃকষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহাদের কষ্ট দূর করিবার উদ্দেশ্যে নিজের মুক্তি সম্বন্ধে রঘুনাথ একটী উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রঘুনাথ সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে ম্লেচ্ছ-চৌধুরী একটু ভয় পাইতেছেন; বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি সেই ম্লেচ্ছের দয়া হইতেছে বলিয়াও বোধ হয় তিনি মনে করিলেন। তাই বিনয়াদি দ্বারা তাঁহাতে দয়ার সম্যক্ উদ্রেক করিয়া তিনি নিজের মুক্তিসাধনের উপায় স্থির করিয়া ম্লেচ্ছ-চৌধুরীর চরণে নিজের কথাগুলি সবিনয়ে নিবেদন করিলেন। **বিনতি**—বিনয়। **সেই ম্লেচ্ছ-পায়**—সেই মুসলমান চৌধুরীর চরণে।

২৪-২৭। "আমার পিতা-জ্যেঠা" হইতে "জিন্দাপীর প্রায়" পর্য্যন্ত চারি পয়ারে মুসলমান চৌধুরীর নিকটে রঘুনাথের বিনয়োক্তি ব্যক্ত করা হইয়াছে।

রঘুনাথ বলিলেন—"হুজুর! আমার পিতা এবং জ্যেঠা আপনারই ভ্রাতৃতুল্য। সব জায়গায়ই ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ করিয়া থাকে; কখনও কলহ হয়, কখনও বা মেলামেশিও হয়; সব সময় একরূপ ভাব থাকে না। এখন আপনাদের তিন ভাইয়ের কলহ হইয়াছে সত্য, দুদিন পরেই কলহ যাইবে, তিন জনের মেলামেশি হইবে। আমি যেমন আমার পিতার বালক, স্নেহের পাত্র, তদ্রূপ আপনারও বালকতুল্য স্নেহের পাত্র। আপনিও আমার পিতার তুল্য পালক, আমিও আপনার পাল্য। পালক হইয়া পাল্যকে তাড়না করা সঙ্গত নহে; আপনি নিজেই সব জানেন, সব বুঝিতে পারেন; আপনি মূর্খ নহেন, সমস্ত শাস্ত্রবাক্যও আপনার জানা আছে। আপনি অধার্ম্মিকও নহেন, আপনাকে আমি জীবন্ত পীর (সিদ্ধ-মহাপুরুষ) বলিয়াই মনে করি। এমতাবস্থায় আপনার নিকটে আমার এসব কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, বালকোচিত বাচালতা মাত্র।" ২৫ পয়ারের স্থলে এরূপ পাঠান্তর আছে:—"ভাই ভাই কলহ আছে সর্ব্বঠাঞি। কৌতুক কলহ প্রীত নিশ্চয় কিছু নাঞি॥" **জিন্দাপীর**—জীবন্তপীর (জীবন্মুক্ত সিদ্ধ-মহাপুরুষ)। **জিন্দাপীর প্রায়**—জিন্দাপীরের তুল্য।

২৮। মন আর্দ্র হৈল—চিত্ত কোমল হইল; মন গলিয়া গেল। **অশ্রু**—চক্ষুর জল।

রঘুনাথের বিনয়োক্তি শুনিয়া ম্লেচ্ছ চৌধুরীর মন গলিয়া গেল, তাঁহার চক্ষুদিয়া জল পড়িতে লাগিল, সেই জলে তাঁহার দাড়ি ভিজিয়া গেল, তিনি কান্দিতে লাগিলেন।

২৯। ম্লেচ্ছ কহে—মুসলমান চৌধুরী। **সূত্র**—কৌশল।

৩০। সেই মুসলমান চৌধুরী নবাবের উজীরকে বলিয়া রঘুনাথকে মুক্ত করিলেন।

তোমার জ্যেঠা নির্ব্বুদ্ধি—অষ্টলক্ষ খায়।
আমিহো ভাগী, আমারে কিছু দিবারে জুয়ায় ॥৩১
যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে।
যেই ভাল্ হয় করুন, ভার দিল তাঁরে ॥ ৩২
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল।
ম্লেচ্ছসহিত অম্বরস সব শান্ত হৈল ॥ ৩৩
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয়-বৎসরে পলাইতে মন কৈল ॥ ৩৪
রাত্র্যে উঠি একলা চলিল পালাইয়া।
দূরে হৈতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া ॥ ৩৫
এইমত বার বার পালায়, ধরি আনে।
তবে তার মাতা কহে তার পিতার স্থানে—॥৩৬
পুত্র বাতুল হৈল, ইহায় রাখহ বান্ধিয়া।
তার পিতা কহে তারে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া—॥ ৩৭
ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম।
এ-সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন ॥ ৩৮
দড়ীর বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে ॥ ৩৯
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হৈয়াছে ইহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে? ॥ ৪০
তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে।
নিত্যানন্দগোসাঞিির পাশ চলিলা আরদিনে ॥৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩১-৩২। "তোমার জ্যেঠা" হইতে "ভার দিল তাঁরে" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে চৌধুরী রঘুনাথকে বলিলেন—"আজ হইতে তুমি আমার পুত্র; কিন্তু তোমার জ্যেঠা নির্ব্বোধ; মোক্তাস্বত্বের মুলুক হইতে তিনি আটলক্ষ টাকা লাভ পায়েন; আমি তাঁহার ভাই বলিয়া ঐ আট লক্ষের অংশ আমিও পাইতে পারি; আমাকে তাহার কিছু অংশ দেওয়া উচিত; কিন্তু তিনি আমাকে কিছু না দিয়া নিজেই আটলক্ষ টাকা ভোগ করিতেছেন। যাহাহউক, তুমি বাড়ীতে যাও, তোমার জ্যেঠাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও। এই সম্বন্ধে তিনি যাহা ভাল মনে করেন, করিবেন; সমস্ত ভার আমি তাঁহার উপরেই দিলাম।"

অষ্টলক্ষ—মোক্তা-মুলুকের মুনাফা আটলক্ষ টাকা। **ভাগী**—ভাই বলিয়া অংশীদার। **দিবারে জুয়ায়**—দেওয়া উচিত।

৩৩। **জ্যেঠা মিলাইল**—জ্যেঠাকে চৌধুরীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। **ম্লেচ্ছসহিত**—চৌধুরীর সহিত। **অম্বরস**—আপোশ। কোনও কোনও গ্রন্থে "বশ কৈল" পাঠান্তর আছে।

৩৪। **এইমত**—নবাব-সরকারে গোলমাল চুকাইতে।

৩৭। **পুত্র**—রঘুনাথ। **বাতুল**—পাগল। **নির্ব্বিণ্ণ**—দুঃখিত। **৩৮। ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য**—স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যের মত অতুল ঐশ্বর্য্য। **স্ত্রী অপ্সরাসম**—অপ্সরার মত পরমা সুন্দরী স্ত্রী। **এসব**—ঐশ্বর্য্য ও স্ত্রী।

৩৯। **প্রারব্ধ**—পূর্ব্বজন্মের ফলোন্মুখ কর্ম্ম। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে রঘুনাথের সংসারে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে; আমি তাহার জন্মদাতা পিতা মাত্র, কিন্তু আমি তাহার সুকৃতির ফল নষ্ট করিতে সমর্থ নহি।

৪০। **চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা** ইত্যাদি—রঘুনাথের প্রতি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপা হইয়াছে; তাই তাঁহার সংসারাসক্তি নষ্ট হইয়াছে; অতুল ঐশ্বর্য্য এবং পরমাসুন্দরী যুবতীভার্য্যাও তাই তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না। **চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণ প্রাপ্তির নিমিত্ত পরম-উৎকণ্ঠায় যে উন্মত্তের মত হইয়াছে।

৪১। **তবে**—বার বার পলাইতে চেষ্টা করিয়াও ধরা পড়ার পরে। **বিচারিলা মনে**—রঘুনাথ বোধ হয় মনে মনে বিচার করিলেন যে, তাঁহার নিজের শক্তিতে ও চেষ্টায় তিনি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে যাইতে পারিবেন না। যদি শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপা হয়, তাহা হইলেই হয়তো তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া তিনি একদিন শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর নিকটে যাওয়ার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

পানিহাটীগ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবকগণ সঙ্গে বহুজন ॥ ৪২
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপরে।
বসি আছেন যেন কোটিসূর্য্যোদয় করে ॥ ৪৩
তলে উপরে বহুভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥ ৪৪
দণ্ডবৎ হঞা সেই পড়িলা কথোদূরে।
সেবক কহে—রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥ ৪৫
শুনি প্রভু কহে—চোরা! দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিমু দণ্ডন ॥ ৪৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪২। **পানিহাটিগ্রামে**—চব্বিশপরগণা জেলায় এই গ্রাম অবস্থিত। রঘুনাথ পানিহাটিতে শ্রীনিতাইচাঁদের দর্শন পাইলেন। প্রভুর সঙ্গে অনেক কীর্ত্তনীয়া ও অনেক ভক্ত ছিলেন। পানিহাটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত। **প্রভুর**—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর।

৪৩। **বৃক্ষমূলে**—প্রভু একটী সুবৃহৎ বটবৃক্ষ-মূলে একটী বেদীর উপরে বসিয়াছিলেন। এমন সময় রঘুনাথ যাইয়া উপস্থিত হইলেন। **পিণ্ডী**—বেদী। **কোটীসূর্য্যোদয় করে**—তখন প্রভুর অঙ্গের জ্যোতি কোটীসূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছিল।

৪৪। **তলে উপরে**—বৃক্ষতলস্থিত পিণ্ডার উপরে ও নীচে। **প্রভুর প্রভাব**—কোটীসূর্য্যজিনি প্রভুর অঙ্গপ্রভা এবং বহু ভক্ত প্রভুর আনুগত্য করিতেছে, এসমস্ত প্রভাব।

৪৫। **সেবক কহে**—সেবক প্রভুকে বলিল।

৪৬। **চোরা**—চোর; ইহা রঘুনাথের প্রতি শ্রীনিতাইচাঁদের অত্যন্ত স্নেহের উক্তি। শ্রীশ্রীগৌরচরণ লাভের জন্য যাঁহার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা, তাঁহার প্রতি শ্রীনিতাইয়ের স্নেহ খুবই স্বাভাবিক। গৌর-কৃপার মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীনিতাই-চাঁদই বলিয়াছেন—"আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি" এবং "যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে যে আমার প্রাণরে।" কিন্তু নিতাইচাঁদের এই স্নেহময় উক্তির পশ্চাতে একটা গূঢ় রহস্যও আছে। যাহার ধন, তাহাকে না জানাইয়া যদি কেহ সেই ধন লইয়া যায় বা লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে চোর বলে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিতাই-চাঁদেরই সম্পত্তি; শ্রীনিতাইচাঁদ কৃপা করিয়া যাঁহাকে শ্রীশ্রীগৌরের চরণ দেন, তিনিই পাইতে পারেন, অন্যে পাইতে পারে না। রঘুনাথ শ্রীনিতাইচাঁদকে না জানাইয়া, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার না করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ পাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন—দুইবার শান্তিপুরে যাইয়া প্রভুর চরণ প্রাপ্তির চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহার পরেও স্বগৃহ হইতে পলাইয়া গিয়া নীলাচলে গৌরচরণ-সান্নিধ্যে উপস্থিতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীনিতাইকে না জানাইয়া তাঁহার সম্পত্তি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণ প্রাপ্তির চেষ্টা, ইহাই রঘুনাথের পক্ষে শ্রীনিতাইচাঁদের ধন চুরির চেষ্টা। চুরির চেষ্টাতেও লোক চোর বলিয়া খ্যাত হয়, গৃহস্থের ঘরে সিঁদ কাটার পরে এবং ঘরে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই যাহাকে পলাইয়া যাইতে হয়, কিম্বা গৃহস্থের হাতে ধরা পড়িতে হয়, তাহাকেও চোর বলা হয়। রঘুনাথ শ্রীনিতাইচাঁদের ধন চুরির চেষ্টা করিয়াছেন, এক্ষণে নিতাইচাঁদের হাতে ধরা পড়িয়াছেন; তাই পরমদয়াল শ্রীনিতাই-চাঁদ তাঁহাকে "চোরা" বলিয়াছেন। গৌরচরণ-প্রাপ্তির পরম উৎকণ্ঠাতেই রঘুনাথের এইরূপ ব্যবহার; তাই তাঁহার প্রতি নিতাইচাঁদের পরমস্নেহের উদ্রেক; তাই তিনি স্নেহ ভরে তাঁহাকে "চোরা" বলিলেন। **করিমু দণ্ডন**—দণ্ড (শাস্তি) দিব। চোর ধরা পড়িয়াছে, কাজেই তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। দণ্ডও অদ্ভুত! মস্তকে চরণ ধারণ (৩।৬।৪৭) এবং সগণে দধিচিড়া ভক্ষণ (৩।৬।৫০)। রঙ্গিয়া নিতাইয়ের অদ্ভুত রঙ্গ!

গৌরচরণ প্রাপ্তির নিমিত্ত রঘুনাথের উৎকণ্ঠা দেখিয়া গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীনিতাইচাঁদের এতই আনন্দ হইয়াছে যে, তিনি যেন আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। রঘুনাথের প্রতি কৃপার বন্যা যেন শ্রীনিতাইচাঁদের হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং এই কৃপাবন্যার উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইয়াই যেন শ্রীনিতাইচাঁদ রঘুনাথকে বলপূর্ব্বক

প্রভু বোলায়, তেঁহো নিকট না করে গমন।
আকর্ষিয়া তার মাথে প্রভু ধরিল চরণ ॥ ৪৭
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়—॥ ৪৮
নিকটে না আইস মোর, ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছোঁ, দণ্ডিমু তোমারে ॥ ৪৯
দধিচিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনি আনন্দিত হৈল রঘুনাথ মনে ॥ ৫০
সেইক্ষণে নিজলোক পাঠাইল গ্রামে।
ভক্ষ্যদ্রব্য লোকসব গ্রাম হৈতে আনে ॥ ৫১
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব আনি প্রভু আগে চৌদিগে ধরিলা ॥ ৫২
'মহোৎসব' নাম শুনি ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসঙ্খ্যগণন ॥ ৫৩
আর আর গ্রাম হৈতে সামগ্রী মাগাইল।
শত দুই চারি হোলনা তাহাঁ আনাইল ॥ ৫৪
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ-সাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিড়া ভিজায় তাতে ॥ ৫৫
একঠাঞি তপ্তদুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক সানিল দধি চিনি কলা দিয়া ॥ ৫৬
আর অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধে ত সানিল।
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল ॥ ৫৭
ধুতি পরি প্রভু যদি পিঁড়িতে বসিলা।
সাতকুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা ॥ ৫৮
চৌতরা উপরে যত প্রভুর নিজ গণ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলীবন্ধন ॥ ৫৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ধরিয়া আনিয়া তাঁহার মস্তকে শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত স্বীয় অভয় চরণদ্বয় স্থাপন করিলেন এবং গৌরস্বর্ব্বস্ব রঘুনাথের দধি-চিড়া-আদি দ্রব্য গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রঘুনাথের এই দ্রব্য শ্রীনিতাইচাঁদ নিজেই ভোজন করিলেন না; শ্রীমন্মহাপ্রভুকেও ভোজন করাইয়াছিলেন (৩।৬।৭৮, ৮৩), ভাগ্যবান্ শ্রীরঘুনাথকেও নিজহস্তে মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ দিয়া কৃতার্থ করিলেন (৩।৬।৯৩)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলায় তাঁহার লীলাশক্তি জীবশিক্ষার নিমিত্ত শ্রীল রঘুনাথদাসের মধ্যে সাধক জীবের ভাব প্রকটিত করিয়া থাকিলেও শ্রীল রঘুনাথ জীবতত্ত্ব নহেন; তিনি নিত্যসিদ্ধপার্ষদ। গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে ব্রজলীলায় তিনি ছিলেন—রসমঞ্জরী; কেহ কেহ তাঁহাকে রতিমঞ্জরীও বলেন, আবার নামভেদে কেহ কেহ ভানুমতীও বলেন। "দাসশ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী। অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীম্। ভানু-মত্যাখ্যয়া কেচিৎদাহুস্তং নামভেদতঃ॥ গৌরগণোদ্দেশ। ১৮৬॥"

৪৭। **আকর্ষিয়া**—প্রভু রঘুনাথকে টানিয়া আনিয়া কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার মাথায় নিজের চরণ ধারণ করিলেন।

৪৯। **ভাগ দূরে দূরে**—দূরে দূরে থাক।

৫০। **দধি চিড়া** ইত্যাদি—আমাকে এবং আমার সঙ্গে যত জন আছে, সকলকে তুমি দধি চিড়া খাওয়াও; ইহাই তোমার দণ্ড। **মোর গণে**—আমার সঙ্গীয় লোকসকলকে।

৫৪। **মাগাইল**—অনুসন্ধান করিয়া আনাইল (মূল্য দিয়া)।

হোলনা—মাটির মালসা (দধি চিড়া খাওয়ার নিমিত্ত)। "শতদুইচারি"-স্থলে "সহস্র সহস্র" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৫৫। **মৃৎকুণ্ডিতা**—মাটির গামলা।

৫৬। **সানিল**—মিশ্রিত করিল।

৫৭। **ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ**—যে দুগ্ধ বেশী জ্বাল দিয়া ঘন করা হইয়াছে। **সানিল**—মিশাইল; ভিজাইল।

৫৮। **পিঁড়িতে**—পিণ্ডাতে; বেদীতে। **সাতকুণ্ডী**—সাতটী (চিড়াপূর্ণ) মাটির বড় গামলা।

৫৯। **চৌতারা**—বাঁধান পিণ্ডার প্রশস্ত স্থান (চত্বর)। **বড় বড় লোক**—বিশিষ্ট লোকসকল। **মণ্ডলী-বন্ধন**—গোলাকার হইয়া।

রামদাস ঠাকুর সুন্দরানন্দদাস গঙ্গাধর।
মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর ॥ ৬০
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বর দাস।
মহেশ গৌরীদাস আর হোড় কৃষ্ণদাস ॥ ৬১
উদ্ধারণদত্ত আদি যত নিজগণ।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন ? ॥ ৬২
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সভায় উপরে বসাইলা ॥ ৬৩
দুই-দুই মৃৎকুণ্ডিকা সভার আগে দিল।
একে দুগ্ধচিড়া আরে দধিচিড়া কৈল ॥ ৬৪
আর যত লোক সব চৌতরা তলানে।
মণ্ডলীবন্ধনে বৈসে নাহিক গণনে॥ ৬৫
একেক জনেরে দুই-দুই হোলনা দিল।
দধিচিড়া দুগ্ধচিড়া দুইতে ভিজাইল ॥ ৬৬
কোন কোন বিপ্র উপরে ঠাঞি না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে যাঞা ॥৬৭
তীরে স্থান না পাইয়া আর কথোজন।
জলে নাম্বি করে দধি-চিপিটক ভক্ষণ ॥ ৬৮
কেহো উপরে, কহো তলে, কেহো গঙ্গাতীরে।
বিশজনা তিন ঠাঁই পরিবেশন করে ॥ ৬৯
হেনকালে আইলা তাহাঁ রাঘবপণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত ॥ ৭০
নিসকৃড়ি নানামত প্রসাদ আনিল।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিল ॥ ৭১
প্রভুরে কহে—"তোমা-লাগি বহুভোগ লাগাইল।
ইহাঁ উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল ॥" ৭২
প্রভু কহে—এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্র্যে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভোজন ॥ ৭৩
গোপজাতি আমি, বহু গোপগণ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এ পুলিনভোজন-রঙ্গে ॥ ৭৪
রাঘবেরে বসাই দুই কুণ্ডী দেয়াইল।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইল ॥ ৭৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬০। "রামদাস-আদি" হইতে "কে করে গণন" পর্য্যন্ত ৬০-৬২ এই তিন পয়ারে প্রভুর নিজ পার্ষদদের কয়েক জনের নাম বলিলেন, তাঁহারা সকলেই পিণ্ডার চত্বরের উপরে বসিয়াছিলেন।

৬২। **নিজগণ**—প্রভুর পার্ষদ; যাঁহারা সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকেন।

৬৪। **দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা**—প্রত্যেককে দুইটী করিয়া মাটির মালসা দিলেন। একটিতে দুগ্ধ-চিড়া অপরটীতে দধিচিড়া। এখানে মৃৎকুণ্ডিকা অর্থ মালসা।

৬৭। **গঙ্গাতীরে যাঞা**—গঙ্গাগর্ভে জলের নিকটে যাইয়া।

৬৯। **তিনঠাঁই**—উপরে, তলে ও গঙ্গাজলে এই তিন যায়গায়। **নিসকৃড়ি**—ফলমুলাদি। **আনিল**—রাঘব-পণ্ডিত বাড়ীতে থাকিতেই চিড়া-মহোৎসবের কথা শুনিয়াছিলেন; তাই তিনি বাড়ী হইতে আসিবার সময় ফলমূলমিষ্টাদি অনেক নিসকৃড়ি প্রসাদ লইয়া আসিয়াছিলেন। **প্রসাদ**—রাঘব পণ্ডিতের সেবিত শ্রীরাধারমণের প্রসাদ। **বাঁটি দিল**—ভাগ করিয়া দিলেন।

৭২। ঐ দিন মধ্যাহ্নে রাঘব-পণ্ডিতের গৃহে প্রভুর ভোজনের কথা ছিল; তাই রাঘব এসব কথা বলিলেন।

৭৪। **গোপজাতি আমি** ইত্যাদি—ব্রজলীলার (বলরামের) ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু এসব কথা বলিলেন। ব্রজলীলায় সমস্ত রাখালগণকে লইয়া কৃষ্ণ-বলরাম একদিন যমুনা-পুলিনে পুলিন-ভোজন করিয়াছিলেন। পানিহাটির চিড়ামহোৎসবে প্রভুর সেই পুলিন-ভোজনের কথা মনে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজে গোপভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং উপস্থিত সকলকেও গোপ বলিয়া প্রভু মনে করিতে লাগিলেন; সম্ভবতঃ, গঙ্গাকেও যমুনা বলিয়া প্রভুর ধারণা হইয়াছিল।

পুলিন-ভোজন-রঙ্গে—পুলিন-ভোজনের কৌতুকে। নদীর তীরবর্ত্তী স্থানকে পুলিন বলে।

৭৫। **দ্বিবিধ**—দুই রকমের; দধিচিড়া ও দুগ্ধ-চিড়া।

সকল লোকের চিড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল ॥ ৭৬
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সভার চিড়া দেখিতে লাগিলা ॥৭৭
সকল কুণ্ডী-হোলনার চিড়া একেক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস ॥ ৭৮
হাসি মহাপ্রভু আর একগ্রাস লঞা।
তার মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া। ৭৯
এইমত নিত্যানন্দ বেড়ায় সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে ॥ ৮০
কি করিয়া বেড়ায়, ইহা কেহো নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে ॥ ৮১
তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বসিলা।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া ডাহিনে রাখিলা ॥ ৮২
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাহাঁ বসাইলা।
দুইভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা ॥ ৮৩
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥ ৮৪
আজ্ঞা দিল—'হরি' বলি করহ ভোজন।
'হরি'-'হরি'-ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন ॥ ৮৫
'হরি হরি' বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন-ভোজন সভার হইল স্মরণ ॥ ৮৬
নিত্যানন্দ প্রভু মহা-কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার ॥ ৮৭
নিত্যানন্দ প্রভাব কৃপা জানিবে কোন্ জন।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিনভোজন ॥ ৮৮
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে 'যমুনা-পুলিন' জ্ঞান কৈলা ॥ ৮৯
'মহোৎসব' শুনি পসারি গ্রাম-গ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৬। **ধ্যানে তবে** ইত্যাদি—সমস্তের পরিবেশন শেষ হইয়া গেলে শ্রীনিতাই-চাঁদ মহাপ্রভুর ধ্যান করিলেন, আর অমনি মহাপ্রভু সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। অবশ্য সকলে মহাপ্রভুকে দেখিতে পায় নাই।

৮১। **কি করিয়া বেড়ায়** ইত্যাদি—সকলে দেখিতেছে, শ্রীনিতাইচাঁদ সকল মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; তাঁহার সঙ্গে যে মহাপ্রভু ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, প্রত্যেক মালসা হইতে এক এক গ্রাস চিড়া লইয়া তাঁহারা যে পরস্পরের মুখে দিতেছেন, এসব সকলে দেখিতে পায় নাই; কোনও কোনও ভাগ্যবান্ মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন।

৮২। **আরোয়া চিড়া**—যে চিড়া হইতে ইতঃপূর্ব্বে এক এক গ্রাস প্রভুদ্বয় পরস্পরের মুখে দেন নাই, সেই চিড়া।

৮৪। এই পয়ারের স্থলে এইরূপ পাঠান্তর আছে ঃ—"মহাপ্রভুর মনে বড় উল্লাস হইলা। দেখি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দ বাড়িলা ॥"

৮৬। **পুলিন-ভোজন** ইত্যাদি—সকলের মনেই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পুলিন-ভোজনের কথা উদিত হইল।

৮৭। **মহাকৃপালু**—অত্যন্ত দয়ালু; রঘুনাথের সামগ্রী অঙ্গীকার করায় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এই উৎসবে আনয়ন করায় শ্রীনিতাইচাঁদের দয়ার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। **উদার**—মহা উদার; অত্যন্ত দাতা। এই উৎসব-উপলক্ষে শ্রীনিতাইচাঁদ কৃপা করিয়া রঘুনাথকে শ্রীচৈতন্য-চরণ-দান করিলেন; ইহাতেই তাঁহার উদারতা প্রকাশ পাইতেছে।

৮৯। শ্রীরামদাসাদি ভক্তগণ এই চিড়া-মহোৎসবে শ্রীকৃষ্ণসখা-গোপগণের ভাবে আবিষ্ট হইলেন; নিজেদিগকে গোপ এবং গঙ্গাতীরকে যমুনা-পুলিন বলিয়া তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল।

যত দ্রব্য লঞা আইসে, সব মূল্যে লয়।
তারি দ্রব্য মূল্যে লঞা তাহারে খাওয়ায়॥ ৯১
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেহো চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ॥ ৯২
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারি কুণ্ডী অবশেষ রঘুনাথে দিল॥ ৯৩
আর তিন কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল।
গ্রাসগ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল॥ ৯৪
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু-আগে দিল।
চন্দন আনিঞা প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল॥ ৯৫
সেবকে তাম্বূল লঞা করে সমর্পণ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ॥ ৯৬
মালা চন্দন তাম্বূল শেষ যে আছিলা।
শ্রীহস্তে প্রভু তাহা সভারে বাঁটি দিলা॥ ৯৭
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা।
আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া॥ ৯৮
এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
'চিড়াদধি-মহোৎসব' খ্যাতি হৈল যার॥ ৯৯
প্রভু বিশ্রাম কৈল, যদি দিন শেষ হৈল।
রাঘব-মন্দিরে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল॥ ১০০
ভক্তসব নাচাইয়া নিত্যানন্দরায়।
শেষে নৃত্য করে—প্রেমে জগৎ ভাসায়॥ ১০১
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্য জন॥ ১০২
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন॥ ১০৩
নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে?।
মহাপ্রভু আইসে যেই নৃত্য দেখিবারে॥ ১০৪
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিল।
ভোজনের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল॥ ১০৫
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজ-গণ লঞা।
মহাপ্রভুর আসন দিল ডাহিনে পাতিয়া॥ ১০৬
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাঢ়িলা॥ ১০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯১। **মূল্যে লয়**—মূল্য দিয়া ক্রয় করে। **মূল্যে লঞা**—মূল্য দিয়া কিনিয়া। **তাহারে**—দোকানদারকে (পসারিকে)।

৯৩। **চারিকুণ্ডী অবশেষ**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ চারিকুণ্ডী। কুণ্ডী অর্থ এখানে মাটীর বড় গামলা। পূর্ব্ববর্ত্তী ৮২ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৯৬। **তাম্বূল**—পান।

৯৮। **প্রভুর শেষ**—প্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ। **আপনার গণ** ইত্যাদি—রঘুনাথ নিজ সঙ্গীয় লোকের সহিত প্রভুর ভুক্তাবশেষ ভাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন।

১০২। কীর্ত্তনের সময় মহাপ্রভুও রাঘবের গৃহে আবির্ভূত হইয়া শ্রীনিতাইচাঁদের নৃত্য দেখিতেছিলেন; কিন্তু শ্রীনিতাইচাঁদ ব্যতীত অপর কেহই মহাপ্রভুকে দেখিতে পায় নাই।

১০৩। শ্রীনিত্যানন্দের নৃত্যের মাধুর্য্যের সহিত উপমা দেওয়ার বস্তু ত্রিজগতে নাই; তাঁহার নৃত্যের উপমা তাঁহারই নৃত্য; অন্য উপমা নাই।

উপমা—তুলনা।

১০৫। **পণ্ডিত**—রাঘব পণ্ডিত। **নিবেদন কৈল**—ভোজন-গৃহে যাওয়ার নিমিত্ত শ্রীনিতাইচাঁদকে নিবেদন করিলেন।

১০৭। ভোজন-সময়েও আবির্ভাবে মহাপ্রভু আসিয়া শ্রীনিতাইচাঁদের ডাইনদিকের আসনে বসিলেন; রাঘব-পণ্ডিত তাঁহার দর্শন পাইলেন।

দুই ভাই-আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা।
সকল বৈষ্ণবেরে পাছে পরিবেশন কৈলা॥ ১০৮
নানাপ্রকার পিঠা পায়স দিব্য শাল্যন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন॥ ১০৯
রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ—অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বারবার॥ ১১০
পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভু-লাগি ভোগ পৃথক্ বাঢ়ায়॥ ১১১
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন॥ ১১২
দুই ভাইকে আনিয়া রাঘব পরিবেশে।
যত্ন করি সব খাওয়ায় না রহে অবশেষে॥ ১১৩
কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি।
রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী॥ ১১৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১০৮। **দুইভাই-আগে**—শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাতে।

১১০। **রাঘবের ঠাকুরের**—রাঘব-পণ্ডিতের সেবিত ঠাকুরের (শ্রীরাধারমণের)। **অমৃতের সার**—অত্যন্ত সুস্বাদু। শ্রীরাধারাণী আবির্ভাবে রাঘবের গৃহে শ্রীরাধারমণের নিমিত্ত পাক করেন বলিয়া প্রসাদ অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। পরবর্ত্তী ১১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **আইসে বার বার**—মহাপ্রভু আবির্ভাবে আসিয়া প্রত্যহই রাঘব-পণ্ডিতের গৃহে ভোজন করেন। শচীমাতার রন্ধনে, নিত্যানন্দের নর্ত্তনে, শ্রীবাসের অঙ্গনে এবং রাঘবের ভবনে এই চারিস্থানে প্রভুর নিত্য আবির্ভাব।

১১১। **পাক করি** ইত্যাদি পয়ারে রাঘব-পণ্ডিতের প্রতিদিনের নিয়মিত-আচণের কথা বলিতেছেন।

১১২। প্রত্যহই মহাপ্রভু রাঘবের গৃহে আবির্ভাবে আসিয়া ভোজন করেন; কিন্তু রাঘব প্রতিদিন প্রভুর দর্শন পায়েন না, কোনও কোনও দিন পায়েন।

১১৩। **দুই ভাইকে** ইত্যাদি পয়ারে আবার (চিড়ামহোৎসবের) রাত্রির কথা বলিতেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী তিন পয়ারে তাঁহার অন্যদিনের সাধারণ রীতির কথা বলিয়াছেন।

১১৪। **রাঘবের ঘরে** ইত্যাদি—রাঘব-পণ্ডিতের সেবিত শ্রীশ্রীরাধারমণের ভোগের পাক শ্রীশ্রীরাধারাণীর অধ্যক্ষতায়ই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দুর্ব্বাসা-ঋষি শ্রীশ্রীরাধারাণীকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, তিনি যাহা পাক করিবেন, তাহা অমৃত অপেক্ষাও সুস্বাদু হইবে এবং যিনি তাহা আহার করিবেন, তিনি দীর্ঘায়ুঃ হইবেন। এজন্য ব্রজলীলায় পুত্রবৎসলা যশোদামাতা প্রত্যহই শ্রীশ্রীরাধারাণীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আহার্য্য প্রস্তুত করাইতেন। শ্রীকৃষ্ণও প্রেয়সী-শিরোমণি রাধারাণীর পাচিত অন্নাদি ভোজন করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেন। তাই রসিক-ভক্তমণ্ডলীও তাঁহাদের প্রাণকোটিপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীশ্রীরাধারাণীর পাচিত অন্নাদি নিবেদন করিবার সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধক-ভক্তের গৃহে সাক্ষাদ্-ভাবে প্রকটিত হইয়া শ্রীরাধারাণী যে রন্ধন-কার্য্য সমাধা করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। যাঁহারা ভোগ রন্ধন করেন, তাঁহারা রন্ধন-সময়ে শ্রীশ্রীরাধারাণীর চরণে প্রার্থনা করেন, তিনি যেন তাঁহার প্রাণবল্লভের ভোগের পাকে কৃপা করিয়া অধ্যক্ষতা করেন, আর তাঁহাদিগকে যেন ঐ রন্ধনের আনুকূল্যার্থ নিয়োজিত করেন। রন্ধনের সময় তাঁহারা মনে করেন, শ্রীরাধারাণীই রন্ধন করিতেছেন, আর তাঁহারই ইঙ্গিতে তাঁহারা রন্ধনের আনুকূল্য করিতেছেন মাত্র। রাঘব-পণ্ডিতের গৃহে যাঁহারা ভোগ-রন্ধন করিতেন, তাঁহারাও ঐরূপই করিতেন, এবং তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার ফলে, শ্রীশ্রীরাধারাণীও কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে রন্ধনের শক্তি দিতেন, তাঁহার শক্তিতে, তাঁহার অধ্যক্ষতাতেই তাঁহারা ভোগ-রন্ধন করিতেন।

যাঁহারা রাগানুগীয়-মার্গে মধুর-ভাবের উপাসক, রন্ধন তাঁহাদের ভজনের একটি বিশেষ অঙ্গরূপে পরিণত হইতে পারে। রন্ধনের প্রারম্ভেই তাঁহারা প্রার্থনা করেন "রাধারাণী, তুমিই তোমার প্রাণবল্লভের নিমিত্ত রান্না

দুর্ব্বাসার ঠাঞি তেঁহো পাইয়াছেন বরে।
অমৃত হইতে তাঁর পাক অধিক মধুরে॥ ১১৫
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ—মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই তাহা খাঞা আনন্দ অপার॥ ১১৬
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে পাছে ইঁহ করিবে ভোজন॥ ১১৭
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন।
হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন॥ ১১৮
ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন।
রাঘব আনি পরাইল মাল্য-চন্দন॥ ১১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করিয়া থাক; তোমার পাচিত দ্রব্যাদিতেই তোমার প্রাণবল্লভ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। আমরা নিতান্ত অধম, আমাদের এমন কোনও যোগ্যতা নাই, যাহাতে আমারা তোমার প্রাণবল্লভের ভোগের নিমিত্ত রন্ধন করিতে পারি। প্রাণেশ্বরি, কৃপা করিয়া তুমিই তোমার প্রাণবল্লভের নিমিত্ত রন্ধন কর, আর কৃপা করিয়া, আমাদিগকে তোমার অনুগতা দাসী মনে করিয়া রন্ধনের সহায়তায় নিযুক্ত কর।" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তাঁহারা মনে করেন, স্বয়ং রাধারাণী আসিয়াই রন্ধনগৃহে বসিয়াছেন, আর তাঁহাদিগকে রন্ধনের আনুকূল্যার্থ নানাবিধ আদেশ করিতেছেন। তাঁহার কৃপাদেশ পাইয়াই যেন তাঁহারা সব কাজ করিতেছেন,—চুলায় আগুন ধরাইতেছেন, তরকারী প্রস্তুত করিতেছেন, চুলায় হাঁড়ি বসাইতেছেন, তাহাতে চাউল, তরকারী-আদি দিতেছেন, জল আনিতেছেন, ইত্যাদি। যখন যে কাজ করার প্রয়োজন হয়, মনে মনে শ্রীরাধারাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার আদেশ লইয়াই যেন সে কাজ করিতেছেন। নিজের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে এ সব কাজ করিতেছেন মনে করিতে পারিলে ভজনের বিশেষ আনুকূল্য হয়।

কেবল রন্ধন কেন, স্ত্রীলোকের প্রায় সমুদয় গৃহকর্ম্মই এইরূপে শ্রীশ্রীরাধারাণীর দাসী-অভিমানে, তাঁহারই ইঙ্গিতে করা হইতেছে বলিয়া স্ত্রীলোকভক্ত মনে করিতে পারেন। পুরুষ ভক্তের কোনও কোনও বিষয়-কর্ম্মও সম্ভবতঃ এইরূপ অভিমানে করা যাইতে পারে। ইহা করিতে পারিলে গৃহকর্ম্মের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেও ভজন চলিতে পারে।

১১৫। দুর্ব্বাসার ঠাঞি—দুর্ব্বাসা ঋষির নিকট। **তেঁহো**—শ্রীরাধাঠাকুরাণী। **বরে**—বর। "রাঘবের ঠাকুরের" হইতে "তাঁর পাক অধিক মধুর" পর্য্যন্ত ১১০-১৫ পয়ারে রাঘব-পণ্ডিতের বাড়ীর প্রসাদের মাহাত্ম্য বলিয়াছেন।

বস্তুতঃ শ্রীশ্রীরাধারাণীকে বর দেওয়ার যোগ্যতা বা অধিকার দুর্ব্বাসা-ঋষির নাই, থাকিতেও পারেনা। ইহা লীলাশক্তিরই এক চাতুর্য্যভঙ্গী—বরের অভিনয়মাত্র। এই বরের ছলেই শ্রীশ্রীযশোদামাতা প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের জন্য রান্না করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীরাধারাণীকে প্রত্যহ যাবট হইতে নন্দালয়ে নেওয়াইতে পারিয়াছিলেন। এই বর না থাকিলে প্রত্যহ পরবধূকে আনাইয়া রান্না করান সম্ভব হইত না (প্রকট ব্রজলীলায় যোগমায়ার প্রভাবে ব্রজবাসীরা শ্রীরাধারাণীকে পরবধূ বলিয়াই মনে করিতেন)। ইহাতেই শ্রীরাধার পক্ষে তাঁহার প্রাণবল্লভের জন্য আহার্য্য-প্রস্তুত করার এবং তদুপলক্ষ্যে পূর্ব্বাহ্নে নন্দালয়ে প্রাণবল্লভের সংক্ষিপ্ত দর্শনাদিরও সুযোগ ঘটিয়াছে। এই সুযোগ সৃষ্টির জন্যই লীলাশক্তি দুর্ব্বাসার যোগে বরদানের অভিনয় করাইয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৬। পূর্ব্বোক্ত "অমৃত নিন্দয়ে" ইত্যাদি ১০৯ পয়ারের সহিত এই পয়ারের অন্বয় করিতে হইবে। রাঘব শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাতে নানাবিধ সুগন্ধি, সুন্দর ও সুস্বাদ প্রসাদ আনিয়া রাখিলেন; তাঁহারা উভয়ে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

দুই ভাই—দুই প্রভু।

১১৭। ভোজন করিবার নিমিত্ত রঘুনাথদাসকেও সকল বৈষ্ণব অনুরোধ করিলেন; কিন্তু পরম-কৃপালু রাঘব-পণ্ডিত বলিলেন—"না, রঘুনাথ এখন বসিবে না; পরে প্রসাদ পাইবে।" প্রভুদ্বয়ের ভোজনের পরে তাঁহাদের অবশেষ গ্রহণ করিয়া তারপর রঘুনাথ প্রসাদ পাইবেন, ইহাই পণ্ডিতের অভিপ্রায়।

ইঁহ—রঘুনাথ।

বিড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন।
ভক্তগণে বিড়া দিল মাল্য-চন্দন। ১২০
রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুই-ভাইয়ের অবশিষ্ট-পাত্র দিল তারে॥ ১২১
কহিল—চৈতন্যগোসাঞি করিয়াছেন ভোজন।
তাঁর শেষ পাইলে, তোমার খণ্ডিল বন্ধন॥ ১২২
ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান্॥ ১২৩
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ॥ ১২৪
প্রাতে নিত্যানন্দপ্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজ-গণ লঞা॥ ১২৫
রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন।
রাঘবপণ্ডিতদ্বারে কৈল নিবেদন॥ ১২৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২০। **বিড়া**—পান।

১২১। **দুই ভাইয়ের অবশিষ্ট**—দুই প্রভুর ভুক্তাবশেষ।

১২২। **তার শেষ** ইত্যাদি—রাঘব-পণ্ডিত রঘুনাথকে বলিলেন, "শ্রীচৈতন্যগোসাঞি এখানে ভোজন করিয়াছেন, তুমি তাঁহার ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়াছ, ইহাতেই তোমার সমস্ত সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া গেল।"

১২৩। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তখন নীলাচলে ছিলেন; কিন্তু কিরূপে তিনি রাঘবের গৃহে ভোজন করিলেন? এই আশঙ্কা-নিরসনের নিমিত্ত বলিতেছেন "ভক্ত-চিত্তে" ইত্যাদি।

পরব্রহ্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুতে অণুত্ব ও বিভুত্ব যুগপৎ বর্ত্তমান। তাঁহার দেহখানি—যাহাকে মানুষের দেহের মত পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ বলিয়াই মনে হয়, তাহাই—সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু। যেই সময়ে এবং যেই দেহে তিনি নীলাচলে সকলের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, ঠিক সেই সময়ে এবং ঠিক সেই দেহেই তিনি সর্ব্বব্যাপক। বাস্তবিক বিভুবস্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন; তবে লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি কৃপা করিয়া যখন যাহাকে দর্শন দেন, তখনই সে তাঁহাকে দেখিতে পারে। প্রকটলীলা-সময়ে তিনি কৃপা করিয়া সকলকে দর্শন দেন এবং তাঁহার লীলা নরলীলা বলিয়া তাঁহার আচরণের সঙ্গে মানুষের আচরণের কতকটা সাদৃশ্য থাকে। তাই তিনি মানুষের মত হাটিয়া নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গেলেন, নীলাচলে অবস্থান করিলেন। সাধারণ লোক মনে করিল, তিনি নীলাচলেই আছেন, অন্যত্র নাই। কিন্তু তাহা নহে; তখনও তিনি সর্ব্বত্র আছেন, সুতরাং রাঘবের গৃহেও আছেন, কখনও গুপ্ত কখনও ব্যক্ত। কেহ কেহ কখনও কখনও তাঁহারই কৃপায় তাঁহাকে দেখিতে পায়। রাঘবের গৃহে ভোজন-সময়ে রাঘবও তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন।

ভক্তচিত্তে ইত্যাদি—তিনি বিভুবস্তু বলিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিলেও ভক্তচিত্তে ও ভক্ত-গৃহে তাঁহার অবস্থানের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করার হেতু বোধ হয় এই যে, ভক্তির প্রভাবে, ভক্তের চিত্তে এবং ভক্তের গৃহেই তাঁহার কৃপা বিশেষরূপে ভক্তকর্ত্তৃক অনুভূত হইয়া থাকে। "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। ১।১।৩০॥" ১।১।২৫-শ্লোকের টীকার শেষ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

স্বতন্ত্র ভগবান্—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজের দ্বারাই নিজে নিয়ন্ত্রিত হয়েন। তিনি কেন যে "কভু গুপ্ত" এবং "কভু ব্যক্ত" হয়েন, তাহার হেতু বলিতেছেন, তিনি "**স্বতন্ত্র ভগবান্**"—তাঁহার ইচ্ছাই ইহার একমাত্র হেতু।

১২৪। **সর্ব্বত্র ব্যাপক**—তিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন। **সদা সর্ব্বত্র বাস**—সকল সময়েই তিনি সকল স্থানে বর্ত্তমান আছেন; যেহেতু তিনি বিভুবস্তু। পূর্ব্ববর্ত্তী ১২৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৫। **প্রাতে**—রাঘবের বাড়ীর উৎসবের (অথবা চিড়া-মহোৎসবের) পরের দিন প্রাতঃকালে। **সেই বৃক্ষ মূলে**—যে বৃক্ষমূলে পূর্ব্বদিন চিড়া-মহোৎসব হইয়াছিল।

১২৬। রঘুনাথ এখন বুঝিতে পারিয়াছেন—শ্রীনিতাইয়ের কৃপা হয় নাই বলিয়াই পুনঃ পুনঃ চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাই এক্ষণে শ্রীনিতাইয়ের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ

অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয়ে—পাঙ্ চৈতন্যচরণ ॥ ১২৭
বামন হঞা যেন চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু যাইতে, কভু সিদ্ধ নয় ॥ ১২৮
যতবার পালাঙ্ আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা-মাতা দুইজনা রাখয়ে বান্ধিয়া ॥ ১২৯
তোমার কৃপা বিনে কেহো চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেহো পায় ॥ ১৩০
অযোগ্য মুঞি, নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি! হইয়া সদয় ॥ ১৩১
মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
'নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ্' কর আশীর্ব্বাদ ॥ ১৩২
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে—।
ইঁহার বিষয়সুখ ইন্দ্রসুখসমে ॥ ১৩৩
চৈতন্যকৃপাতে সেহো নাহি ভায় মনে।
সভে আশীষ দেহ—পায় চৈতন্য-চরণে ॥ ১৩৪
কৃষ্ণপাদপদ্মগন্ধ যেইজন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তারে নাহি ভায় ॥ ১৩৫

তথাহি (ভাঃ ৫।১৪।৪৩)—
যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তার মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা—॥ ১৩৬
তুমি যে করাইলে এই পুলিন ভোজন।
তোমায় কৃপা করি চৈতন্য কৈলা আগমন ॥ ১৩৭
কৃপা করি কৈল দুগ্ধ চিপীট ভক্ষণ।
নৃত্য দেখি রাত্র্যে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ তিনি মনে করিলেন, নিতাইচাঁদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করার যোগ্যতাও তাঁহার নাই; তাই তিনি শ্রীপাদ রাঘব পণ্ডিতের নিকটে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারই কথা শ্রীনিতাইচাঁদের চরণে নিবেদন করার জন্য অনুরোধ করিলেন। অভিপ্রায় এই—শ্রীল রাঘবপণ্ডিতের প্রতি শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের অসাধারণ কৃপা; তিনি যদি আমার মত অযোগ্য পামরের জন্য শ্রীনিতাইয়ের চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, আমার প্রতি প্রভুর কৃপা হইতে পারে।

পরবর্ত্তী ১২৭-১৩২ পয়ারে রঘুনাথের কথাই শ্রীল রাঘব পণ্ডিতের মুখে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩৩। "ইঁহার বিষয়-সুখ" হইতে "তারে নাহি ভায়।" পর্য্যন্ত শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর উক্তি।

ইঁহার—রঘুনাথের।

১৩৪। **নাহি ভায়**—ভাল লাগেনা। **আশীষ**—আশীর্ব্বাদ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ নিজেও রঘুনাথের প্রতি কৃপা করিলেন এবং উপস্থিত বৈষ্ণবগণকেও বলিলেন, যেন তাঁহারাও রঘুনাথকে কৃপা করেন—যাহাতে রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ পাইতে পারেন। বৈষ্ণবগণের নিকটে রঘুনাথের জন্য আশীর্ব্বাদ চাওয়াতেই তাঁহার প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা সূচিত হইতেছে।

১৩৫। **ব্রহ্মলোক**—ব্রহ্মাণ্ডস্থ সত্যলোক। **ব্রহ্মলোক আদি-সুখ**—ব্রহ্মলোকাদিতে উপভোগ্য সুখ। **তারে নাহি ভায়**—তাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করে না। ইহলোকে স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গ-সুখের কথা তো অতি তুচ্ছ।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ২।২৩।১২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যাঁহাদের রতি জন্মিয়াছে, ধন-সম্পদ্-স্ত্রী-পুত্রাদি যে তাঁহাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারেনা, তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক; এইরূপে ইহা ১৩৫ পয়ারের প্রমাণ।

১৩৭। রঘুনাথের প্রতি যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হইয়াছে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ তাহাই তাঁহাকে জানাইতেছেন।

১৩৮। **দুগ্ধ-চিপীট**—দুগ্ধ চিড়া। **নৃত্য দেখি**—রাঘবের গৃহে রাত্রিতে নৃত্যকীর্ত্তনাদি দেখিয়া। **প্রসাদ-ভোজন**—রাঘবের গৃহে রাত্রিতে প্রসাদ-ভক্ষণ।

তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইল আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে ॥ ১৩৯
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
'অন্তরঙ্গ ভৃত্য' করি রাখিবেন চরণে ॥ ১৪০
নিশ্চিন্ত হইয়া যাহ আপন ভবনে।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণে ॥ ১৪১
সব ভক্তগণে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইল।
তাঁ সভার চরণ রঘুনাথ বন্দিল ॥ ১৪২
প্রভুর আজ্ঞা লৈয়া বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল।
রাঘব-সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল ॥ ১৪৩
যুক্তি করি শতমুদ্রা সোনা তোলা-সাত।
নিভৃতে দিল প্রভুর ভাণ্ডারীর হাথ ॥ ১৪৪
তারে নিষেধিল—প্রভুকে এবে না কহিবা।
নিজঘরে যাবে যবে, তবে নিবেদিবা ॥ ১৪৫
তবে রাঘবপণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
ঠাকুর দর্শন করাইয়া মালা-চন্দন দিলা ॥ ১৪৬
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে।
তবে পুনঃ রঘুনাথ কহে পণ্ডিতেরে—॥ ১৪৭
প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ভৃত্যাশ্রিত জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সভার চরণ ॥ ১৪৮
বিশ পঞ্চদশ বার দশ পঞ্চ হয়।
মুদ্রা দেহ বিচারি যার যত যোগ্য হয় ॥ ১৪৯
সব লেখা করিয়া রাঘব-পাশ দিলা।
যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা ॥ ১৫০
একশত মুদ্রা আর সোনা তোলাদ্বয়।
পণ্ডিতের আগে দিল করিয়া বিনয় ॥ ১৫১
তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দকৃপায় আপনাকে 'কৃতার্থ' মানিলা ॥ ১৫২
সেই হৈতে অভ্যন্তর না করে গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে যাঞা করেন শয়ন ॥ ১৫৩
তাহাঁ জাগি রহে সব রক্ষকের গণ।
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন ॥ ১৫৪
হেনকালে গৌড়ের সব গৌরভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩৯। **উদ্ধারিতে**—সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করিতে। **বিঘ্নাদি-বন্ধনে**—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে যাওয়ার প্রতিকূলে যতরকম বাধাবিঘ্ন আছে, তৎসমস্ত (প্রভুর কৃপায় দূরীভূত হইল ; এখন তুমি স্বচ্ছন্দে প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে যাইতে পারিবে)।

১৪০। **স্বরূপের স্থানে**—স্বরূপ-দামোদরের তত্ত্বাবধানে। মহাপ্রভু রঘুনাথদাসের নিমিত্ত কি বন্দোবস্ত করিবেন, শ্রীনিতাইচাঁদ এখনই তাহা জানাইয়া দিতেছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রভু কি করিবেন, তাহা শ্রীনিতাই পূর্ব্ব হইতে কিরূপে জানিলেন ? ইহা জানা শ্রীনিতাইয়ের পক্ষে অসম্ভব নহে, কারণ নিতাই-চৈতন্যে কোনও ভেদ নাই, তাঁহারা একই, দুইভাগে প্রকট হইয়াছেন মাত্র।

১৪৪। রাঘব পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিয়া রঘুনাথদাস, শ্রীমন্নিত্যানন্দের সেবার নিমিত্ত, প্রভুর ভাণ্ডারীর নিকটে অতি গোপনে একশত টাকা এবং সাত তোলা সোনা দিলেন।

নিভৃতে—গোপনে ; প্রভু যেন এখন জানিতে না পারেন, এই ভাবে ; প্রভু জানিতে পারিলে হয়তো গ্রহণ করিতে অসম্মত হইবেন।

১৪৬। **ঠাকুরদর্শন**—রাঘবের সেবিত শ্রীরাধারমণের দর্শন।

১৪৮। **ভৃত্যাশ্রিত জন**—ভৃত্য এবং আশ্রিত লোক। "মহান্ত আর ভৃত্যগণ"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

১৫০। **চিঠি লেখাইল**—ফর্দ্দ করিলেন।

১৫৩। **অভ্যন্তর**—বাড়ীর ভিতরে ; অন্দর-মহলে। **দুর্গামণ্ডপ**—দুর্গাপূজার মন্দির।

তাঁ-সভার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গে তবহিঁ ধরা পড়ে॥ ১৫৬
এইমত চিন্তিতেই দৈবে একদিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করি আছেন শয়নে॥ ১৫৭
দণ্ডচারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিলা প্রবেশ॥ ১৫৮
বাসুদেবদত্তের তেঁহো হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তেঁহো হয় পুরোহিত॥ ১৫৯
অদ্বৈত-আচার্য্যের তেঁহো শিষ্য অন্তরঙ্গ।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে—চৈতন্য প্রাণধন॥ ১৬০
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো যবে দাণ্ডাইলা।
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা॥ ১৬১
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে—॥ ১৬২
রঘুনাথে কহে—তারে করহ সাধন।
সেবা যেন করে, আর নাহিক ব্রাহ্মণ॥ ১৬৩
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা।
রক্ষক সব শেষরাত্রে নিদ্রায় পড়িলা॥ ১৬৪
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে।
কহিতে-শুনিতে দোঁহে চলে সেইপথে॥ ১৬৫
অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে—।
আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাইব তোমাস্থানে॥ ১৬৬
তুমি সুখে ঘর যাহ, মোরে আজ্ঞা হয়।
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয়—॥ ১৬৭
'সেবক রক্ষক আর কেহো নাহি সঙ্গে!
পলাইতে আমার ভাল এই ত প্রসঙ্গে'॥ ১৬৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫৬। **প্রসিদ্ধ প্রকট** ইত্যাদি—গৌড়ের ভক্তগণ যে নীলাচলে যাইতেছেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে—সকলেই জানে; তাঁহারা কোন্ পথে যাইতেছেন তাহাও সকলে জানে; সুতরাং রঘুনাথ যদি তাঁহাদের সঙ্গে যায়েন, তবে সহজেই ধরা পড়িবার সম্ভাবনা।

১৫৮। চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে যদুনন্দন আচার্য্য, রঘুনাথ যে দুর্গামণ্ডপে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দুর্গামণ্ডপের নিকটে আসিলেন।

১৫৯। যদুনন্দন-আচার্য্যের পরিচয় দিতেছেন। যদুনন্দন-আচার্য্য বাসুদেবদত্তের কৃপাপাত্র এবং রঘুনাথ-দাসের দীক্ষাগুরু এবং পুরোহিতও বটেন।

১৬০। যদুনন্দন-আচার্য্য শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য এবং অত্যন্ত অন্তরঙ্গ (অনুগত) ভক্ত। **আচার্য্য আজ্ঞাতে**—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের আদেশে যদুনন্দন-আচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই স্বীয় প্রাণসর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করেন। যদুনন্দন অদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দের মতাবলম্বী ছিলেন; সুতরাং শ্রীঅদ্বৈতকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত নহেন, ইহা বলাই এই পয়ারার্দ্ধের উদ্দেশ্য।

১৬১। **অঙ্গনে**—দুর্গামণ্ডপের অঙ্গনে। **তেঁহো**—যদুনন্দন-আচার্য্য।

১৬২। **তাঁর এক শিষ্য**—যদুনন্দনের এক ব্রাহ্মণ-শিষ্য।

১৬৪। **রক্ষক সব** ইত্যাদি—শেষ রাত্রিতে রঘুনাথের রক্ষকেরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া রঘুনাথ যে যদুনন্দনের সঙ্গে চলিয়া যাইতেছেন, ইহা কেহ টের পাইল না; সুতরাং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেও কেহ যাইতে পারিল না।

১৬৫। **পূর্ব্ব দিশাতে**—রঘুনাথের গৃহ হইতে পূর্ব্বদিকে।

১৬৭। **মোরে আজ্ঞা হয়**—রঘুনাথ তাঁহার গুরুদেবকে বলিলেন—"আপনি গৃহে যাউন; আমিই আপনার পূজারী-শিষ্যকে বলিয়া কহিয়া পাঠাইয়া দিব। আমাকে আদেশ করুন।" যদুনন্দন মনে করিলেন, পূজারী শিষ্যকে সাধিবার নিমিত্ত রঘুনাথ একাকী যাওয়ার আদেশই প্রার্থনা করিতেছেন, তাই তিনিও আদেশ দিলেন এবং নিজে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু রঘুনাথ অন্য উদ্দেশ্যে গুরুদেবের আদেশ ভিক্ষা করিলেন—তিনি মনে মনে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনার্থ নীলাচলে যাত্রা করার আদেশই প্রার্থনা করিয়াছিলেন; শ্রীচৈতন্যের কৃপা-ভঙ্গীতে যত্নন্দন রঘুনাথের মনের ভাব বুঝিতে পারেন নাই; তিনি আদেশ দিলেন। এই ছলে গুরুর আদেশ লইয়া রঘুনাথ নীলাচলে পলায়ন করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

শান্তিপুরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণ দর্শন করিয়া রঘুনাথ যখন গৃহত্যাগের সঙ্কল্প জানাইয়াছিলেন, তখন প্রভু বলিয়াছিলেন,—"এখন তুমি গৃহে যাও, অনাসক্ত হইয়া বিষয়-কর্ম্ম কর। আমি যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিব, "তবে তুমি মোর পাশ আসিহ কোন ছলে। সে কালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে॥ ২।১৬।২৩৮-৩৯॥" এক্ষণে "কৃষ্ণ সেই ছল" স্ফুরাইলেন। রঘুনাথকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে, যত্নন্দন আচার্য্যের পূজারীর চিত্তে সেবা ছাড়িয়া পলায়নের ইচ্ছা কৃষ্ণই স্ফুরিত করিয়াছেন, শেষ রাত্রিতে রক্ষকগণকে কৃষ্ণই নিদ্রিত করাইয়াছেন, রঘুনাথের প্রার্থনায় পূজারীর অনুসন্ধানে রঘুনাথকে একাকী পাঠাইয়া নিজে গৃহে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছাও যত্নন্দনের চিত্তে কৃষ্ণই স্ফুরিত করিয়াছেন, রঘুনাথের যে পলায়নের সম্ভাবনা আছে, যত্নন্দনের মনে এসন্দেহও কৃষ্ণই উদিত হইতে দেন নাই। সর্ব্বশেষে ছলপূর্ব্বক গুরুদেবের চরণে নীলাচল-যাত্রার আদেশ প্রার্থনার ইচ্ছাও রঘুনাথের চিত্তে কৃষ্ণই স্ফুরিত করিয়াছেন এবং শেষ-রাত্রিতে রঘুনাথকে একাকী ছাড়িয়া দিলে তাঁহার যে পলায়নের সুযোগ এবং সম্ভাবনা হইবে, যত্নন্দনের মনে এইরূপ সন্দেহও কৃষ্ণই উদিত হইতে দেন নাই। রঘুনাথের পলায়নের অনুকূল সমস্ত সুযোগই কৃষ্ণ উপস্থিত করিলেন। তাই বোধ হয় পূর্ব্বেই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রঘুনাথকে শান্তিপুরে বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণ কৃপা যারে তারে কে রাখিতে পারে? ২।১৬।২৩৯॥"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই যে শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের আবির্ভাব, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহা লিখিয়াছেন—১।১৩।৫৩ পয়ারে। যাহা হউক, অন্ত্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, হরিদাস-ঠাকুর বেণাপোল হইতে সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুরে আসেন। তখন "রঘুনাথদাস বালক করে অধ্যয়ন। হরিদাস-ঠাকুরে যাই করে দরশন॥ হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে। সেই কৃপা কারণ হৈল তাঁরে চৈতন্য পাইবারে॥ ৩।৩।১৬১-৬২॥" চাঁদপুর হইতে হরিদাস শান্তিপুরে আসেন (৩।৩।২০১)। শ্রীমদ্‌ অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার জন্য গঙ্গাতীরে একটী গোঁফা করিয়া দিলেন। শ্রীঅদ্বৈত "কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিল। জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥ হরিদাস করে গোঁফায় নাম সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে এই তাঁর মন॥ দুইজনার ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার। নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার॥ ৩।৩।২১১-১৩॥" এই সমস্ত উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই শ্রীল রঘুনাথদাসের আবির্ভাব। চব্বিশ বৎসর বয়সে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের পরে দাক্ষিণাত্য, গৌড় এবং বৃন্দাবন ভ্রমণাদিতে প্রভুর ছয় বৎসর লাগিয়াছিল। সুতরাং প্রভু যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসেন, তখন প্রকট লীলায় তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর। বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে ফিরিয়া আসার সংবাদ পাইয়াই রঘুনাথ প্রভুর নিকটে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছিলেন (৩।৬।১৫); ঠিক এই সময়ে তিনি ম্লেচ্ছ উজীর কর্ত্তৃক বন্দী হয়েন (৩।৬।১৯); স্বীয় বুদ্ধি-চাতুর্য্যে তিনি মুক্তি পাইলেন। "এই মত রঘুনাথের বৎসরেক গেল। দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল॥ ৩।৬।৩৪॥" বার বার পলাইয়া যায়েন; কিন্তু পিতা-জ্যেঠা ধরিয়া আনেন। তার পরে "রঘুনাথ বিচারিলা মনে। নিত্যানন্দ গোস্বাঞির পাশ চলিলা আর দিনে॥ ৩।৬।৪১॥" পাণিহাটীতে শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরণ দর্শন করিয়া এবং চিড়া-মহোৎসব সম্পাদন করিয়া রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পরেই তিনি নীলাচলে যাত্রা করেন। যখন তিনি যাত্রা করেন, তখন সেন-শিবানন্দাদি গৌড়ীয়-ভক্তগণও রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচল যাইতেছিলেন (৩।৬।১৫৫, ১৭৬-৮০)। ইহা হইতেছে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসার দুই বৎসর পরের রথযাত্রা। সুতরাং রঘুনাথ যখন নীলাচল যাত্রা করেন, তখন প্রকটলীলায় প্রভুর বয়স দ্বাত্রিশ বৎসর। কবিরাজ অন্যত্রও লিখিয়াছেন—রঘুনাথ স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে ষোল বৎসর ব্যাপিয়া প্রভুর অন্তরঙ্গ

এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে করিল গমন।
উলটিয়া চাহে পাছে, নাহি কোন জন॥ ১৬৯
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ চিন্তিয়া !
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া॥ ১৭০
গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যায় বনে বনে।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্য-চরণে॥ ১৭১
পঞ্চদশক্রোশ চলি গেল একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে॥ ১৭২
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা॥ ১৭৩
এথা তাঁর সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া।
তাঁর গুরু-পাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া॥ ১৭৪
তেঁহো কহে—আজ্ঞা মাগি গেল নিজঘর।
'পলাইল রঘুনাথ'—উঠিল কোলাহল॥ ১৭৫
তাঁর পিতা কহে—গৌড়ের সব ভক্তগণ।
প্রভুস্থানে নীলাচলে করিয়াছে গমন॥ ১৭৬
সেইসঙ্গে রঘুনাথ গেলা পালাইয়া।
দশজন যাহ, তারে আনহ ধরিয়া॥ ১৭৭
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া—।
আমার পুত্রেরে তুমি দিবে বাহুড়িয়া। ১৭৮
ঝাঁকরা-পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জন।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ॥ ১৭৯
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিল।
শিবানন্দ কহে—তেঁহো ইহাঁ না আইল॥ ১৮০
বাহুড়িয়া সেই দশ জন আইলা ঘর।
তাঁর মাতা-পিতা হৈল চিন্তিত-অন্তর॥ ১৮১
এথা রঘুনাথদাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণমুখ হঞা॥ ১৮২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সেবা করিয়াছিলেন (১৷১০৷৯০-১)—প্রভুর অন্তর্দ্ধানের সময় পর্য্যন্ত। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে প্রভু লীলা সম্বরণ করেন। ৪৮ হইতে ১৬ বাদ দিলে থাকে ৩২। ইহা হইতেও জানা যায়, প্রভুর ৩২ বৎসর বয়সের সময়েই রঘুনাথ তাঁহার চরণে মিলিত হইয়াছিলেন। প্রভুর আবির্ভাবের জন্য শ্রীঅদ্বৈতের এবং শ্রীহরিদাসের আরাধনার পূর্ব্বেই যখন রঘুনাথ অধ্যয়নে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ইহাই মনে হয় যে, তিনি যেন প্রভুর আবির্ভাবের অন্ততঃ আট দশ বৎসর পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে রঘুনাথ যখন নীলাচল যাত্রা করেন, তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে ১৪০৭ শকে; তাহা হইল আনুমানিক **১৩৯৭-৯৮ শকেই রঘুনাথদাসের আবির্ভাব** হইয়া থাকিবে। কবিরাজ গোস্বামীর উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ অনুমান করা হইল।

১৭০। **পথ ছাড়ি উপপথে** ইত্যাদি—তাঁহার পলায়নের সন্দেহ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে লোক বাহির হইতে পারে; প্রসিদ্ধ পথে গেলে তাহাদের হাতে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা; তাই রঘুনাথ পথ ছাড়িয়া উপপথে—অপ্রসিদ্ধ ছোট পথে দ্রুতবেগে গমন করিলেন।

১৭২। **গোপের বাথান**—গোয়ালাদিগের গরু রাখিবার স্থান।

১৭৪। **গুরু-পাশে**—যদুনন্দন-আচার্য্যের নিকটে।

১৭৮। **শিবানন্দে পত্রী দিল**—গৌড়-দেশ হইতে যেসকল ভক্ত নীলাচলে যাইতেন, শিবানন্দসেনই অধ্যক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এজন্য শিবানন্দের নিকটেই পত্র দেওয়া হইল। **দিবে বাহুড়িয়া**—ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিবে।

১৮২। প্রথম দিন রঘুনাথ সপ্তগ্রাম হইতে পূর্ব্ব-দিকে পনর ক্রোশ পর্য্যন্ত চলিয়াছিলেন। পরের দিন প্রাতঃকালে ঐস্থান হইতে (বাথান হইতে) দক্ষিণদিকে রওনা হইলেন। ধরা পড়ার আশঙ্কাতেই প্রথম হইতে দক্ষিণ দিকে না যাইয়া পূর্ব্বদিকে গিয়াছিলেন।

ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরান।
কুগ্রাম দিয়া-দিয়া করিল প্রয়াণ ॥ ১৮৩
ভক্ষণাপেক্ষা নাহি, সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে চৈতন্য-চরণ-প্রাপ্ত্যে মন ॥ ১৮৪
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধ-পান।
যবে যেই মিলে, তাতে রাখে নিজপ্রাণ ॥ ১৮৫
বারোদিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিনদিনমাত্র করিলা ভোজন ॥ ১৮৬
স্বরূপাদিসহ গোসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিলা আসিয়া ॥ ১৮৭
অঙ্গনে দূরে রহি করেন প্রণিপাত।
মুকুন্দদত্ত কহে—এই আইলা রঘুনাথ ॥ ১৮৮
প্রভু কহে—'আইস' তেঁহো ধরিল চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৮৯
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল।
প্রভু-কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল ॥ ১৯০
প্রভু কহে—কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সভা হৈতে।
তোমাকে কাঢ়িল বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে ॥ ১৯১
রঘুনাথ মনে কহে—কৃষ্ণ নাহি জানি।
তোমার কৃপায় কাঢ়িল আমা, এই আমি মানি ॥ ১৯২
প্রভু কহেন—তোমার পিতা-জ্যেঠা দুইজনে।
চক্রবর্ত্তিসম্বন্ধে হাম 'আজা' করি মানে ॥ ১৯৩
চক্রবর্ত্তীর দোঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস।
অতএব তাঁরে আমি করি পরিহাস ॥ ১৯৪
ইঁহার বাপ-জ্যেঠা বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া।
'সুখ' করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥ ১৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৮৩। **ছত্রভোগ**—বর্ত্তমান সুন্দরবনের অন্তর্গত স্থান বিশেষ। **সরান**—প্রসিদ্ধ রাজপথ। **কুগ্রাম**—অপ্রসিদ্ধ গ্রাম। **প্রয়াণ**—গমন।

১৮৪। **ভক্ষণাপেক্ষা**—ভোজনের অপেক্ষা।

১৮৫। **চর্ব্বণ**—শুক্না চানা-আদি চর্ব্বণ।

১৯০। **প্রভু-কৃপা দেখি** ইত্যাদি—রঘুনাথের প্রতি প্রভুর অত্যন্ত কৃপা দেখিয়া সকল বৈষ্ণবই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

১৯১। **বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্ত**—বিষয়রূপ-বিষ্ঠার গর্ত্ত।

১৯৩-৯৪। **তোমার পিতা জ্যেঠা**—রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধনদাস এবং তাঁহার জ্যেঠা হিরণ্যদাস। **চক্রবর্ত্তী**—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ। **আজা**—পশ্চিমবঙ্গে মাতামহকে আজা বলে।

প্রভু বলিলেন,—"আমার আজা নীলাম্বর-চক্রবর্ত্তী হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসকে ছোট-ভাইয়ের মতন স্নেহ করেন; তাঁহারাও আমার আজাকে বড় ভাইয়ের মতন শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন; সেইভাবে তাঁহার সেবাও করেন। সুতরাং আমার আজার সম্বন্ধে আমি তাঁহাদিগকেও আজা বলিয়াই মনে করি। আমি তাঁহাদের নাতির তুল্য; তাই আমি তাঁহাদিগকে সময় সময় পরিহাসাদিও করিয়া থাকি।"

তারে—হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাসকে। **পরিহাস**—ঠাট্টা-বিদ্রূপ।

১৯৫। এই পয়ারে আজা বলিয়া হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসকে প্রভু পরিহাস করিতেছেন।

ইঁহার বাপ-জ্যেঠা—রঘুনাথের বাপ এবং জ্যেঠা। **বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া**—বিষয়রূপ বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট।

প্রভু ঠাট্টা করিয়া বলিতেছেন,—"বিষ্ঠার কীট যেমন সর্ব্বদা বিষ্ঠাগর্ত্তেই ডুবিয়া থাকে, তাহাতেই সুখ অনুভব করে, রঘুনাথের বাপ-জ্যেঠাও তেমনি সর্ব্বদা বিষয় নিয়াই ব্যস্ত, বিষয়ের যন্ত্রণাকে তাঁহারা যন্ত্রণা বলিয়াই মনে করেন না, পরন্তু অত্যন্ত সুখের বিষয় বলিয়াই মনে করেন।" প্রভু ঠাট্টা করিয়া হিণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসকে বিষ্ঠার কীট বলিলেন। প্রভু তাঁহাদের নাতি কিনা, তাই দাদামহাশয়দিগকে এইরূপ-পরিহাস করিলেন।

যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়। | শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, হয়ে বৈষ্ণবের প্রায়॥ ১৯৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৯৬। যদিও হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস অনেক ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দেন, অনেক ব্রাহ্মণকে সাময়িক ভাবেও অনেক সহায়তা করেন, তথাপি তাঁহাদের আচরণ সম্যক্‌রূপে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আচরণ নহে, কোনও কোনও বিষয়ে বৈষ্ণবের আচরণের মতন হয় মাত্র।

যদ্যপি ব্রহ্মণ্য ইত্যাদি—হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস ধার্ম্মিক, সুপণ্ডিত এবং অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ইঁহাদের অর্থ-সাহায্যেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের প্রায় সকলেই ইহাঁদের বৃত্তি-ভোগী ছিলেন। অনেকেই নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেন; ব্রাহ্মণদিগকে বৎসর বৎসর অর্থদান করার বন্দোবস্তও ছিল। এতদ্ব্যতীত ইঁহাদের বাড়ীতে যাগ-যজ্ঞ-পূজা-অর্চ্চনাদিতেও ব্রাহ্মণদিগের অনেক অর্থলাভ হইত। বস্তুতঃ, ইহাঁদের বদান্যতায় নদীয়াবাসী অনেক ব্রাহ্মণই জীবিকা-নির্ব্বাহ-সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতেন। "মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য॥ সদাচার সৎকুলীন ধার্ম্মিক-অগ্রগণ্য॥ নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়। অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়॥ ২।১৬।২১৬-১৭॥" সহস্র সহস্র দীনদুঃখীও ইঁহাদের বদান্যতায় সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত। ইঁহাদের দানশীলতার উল্লেখ করিয়া তখনকার লোকে বলিত—'পাতালে বাসুকির্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ। গৌড়ে গোবর্দ্ধনোদাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ—সঙ্গীতমাধব নাটক।"

ব্রাহ্মণের সেবা চৌষট্টি-অঙ্গ-সাধন-ভক্তির মধ্যেও একটী:—ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন। ২।২২।৬৩॥" অবশ্য ইহা বৈষ্ণবের মুখ্য ভজনাঙ্গ নহে, ভক্তিমার্গের আরম্ভ-স্বরূপ বা দ্বার-স্বরূপ বলিয়া যে বিশটী অঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী মাত্র।

জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবের প্রতিও হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। শ্রীল-হরিদাস ঠাকুর যখন তাঁহাদের সভায় গিয়াছিলেন, তাঁহাদের তখনকার আচরণই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হরিদাস-ঠাকুরের দর্শন মাত্রেই তাঁহারা গাত্রোত্থান করিলেন, পরে পায়ে পড়িয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিলেন এবং অত্যন্ত সম্মান করিয়া তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন:—"ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান। পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥ ৩।৩।১৬৫॥" প্রবল-প্রতাপান্বিত সৎকুলীন কায়স্থ ভূম্যধিকারীর পক্ষে কাঙ্গাল যবন-হরিদাসের প্রতি এইরূপ সম্মান-প্রদর্শনেই তাঁহাদের চিত্তের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

গোপাল-চক্রবর্ত্তি-নামক তাঁহাদের জনৈক ব্রাহ্মণ-কর্ম্মচারী "ভাবক" বলিয়া হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি কিঞ্চিৎ অমর্য্যাদা দেখাইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎই তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহাদের কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, ইহাও তাহার একটী প্রমাণ।

শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিলেন, হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন।

কিন্তু শুদ্ধ-বৈষ্ণব কাহাকে বলে? যাঁহার আচরণে, অনুষ্ঠানে এবং চিন্তায়, বৈষ্ণবের যাহা লক্ষ্য তাহার প্রতিকূল কিছুই থাকে না, সেই বৈষ্ণবকেই শুদ্ধ-বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। বৈষ্ণবের লক্ষ্য হইল—ভাবানুকূল সিদ্ধদেহে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেম-সেবা-প্রাপ্তি, স্বসুখ-বাসনা-গন্ধ-শূন্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাপ্রাপ্তি। এই উদ্দেশ্যে সাধক-বৈষ্ণব যে সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাহাতেও কৃষ্ণসুখ-বাসনা ব্যতীত অন্য সকল প্রকারের বাসনাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে হয়; তাহাতে, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদির যে লক্ষ্য, তাহার ছায়াও থাকিতে পারিবে না; তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল অনুশীলন মাত্র—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ১।১।৯॥" সাধকের চিত্তে যদি ইহকালের ও পরকালের কোনওরূপ সুখভোগের কামনা স্থান পায়, তাহা হইলে তাঁহার অনুষ্ঠান তাঁহার লক্ষ্য-প্রাপ্তির ঠিক অনুকূল হইবে না। ভক্তিরস্য ভজনং

তথাপি বিষয়ের স্বভাব—করে মহা অন্ধ। | সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ॥ ১৯৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ইহামুত্রোপাধিনৈরস্থেন অমুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনম্।—শ্রুতি। মধ্যলীলার ২২শ পরিচ্ছেদে বৈষ্ণবাচার-প্রসঙ্গে শ্রীমন্-মহাপ্রভুও তাহাই বলিয়াছেন—অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ ইত্যাদি কতিপয় পয়ারে ২।২২।৪৯-৫০॥

তাহা হইলে, কৃষ্ণকামনা ও কৃষ্ণভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনাই হইল বৈষ্ণবের বিশুদ্ধতার হানিজনক; তাহাই বাস্তবিক দুঃসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ। "দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম-বঞ্চনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥ ২২৪।৭০॥"

স্বসুখ-বাসনা হইতেই অন্য কামনা জন্মে; যত রকমের স্বসুখ-বাসনা আছে, বিষয়াসক্তিতেই তাহাদের অভিব্যক্তি। সুতরাং বিষয়াসক্তি যতদিন পর্য্যন্ত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত চিত্তে অন্য কামনা আছে বুঝিতে হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির জন্য প্রকৃত কামনা জন্মে নাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং ততদিন পর্য্যন্তই সাধারণ আচরণাদিতে বৈষ্ণবের লক্ষ্য-প্রাপ্তির প্রতিকূল অনেক বস্তু থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার প্রতি ভক্তির কৃপা হইতে পারে না। "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্‌ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ১।২।১৫॥" তাহা হইলে দেখা গেল, বিষয়াসক্তিই বৈষ্ণবের অবিশুদ্ধতার হেতু; যতদিন বিষয়াসক্তি থাকিবে, ততদিন কেহই "শুদ্ধ-বৈষ্ণব" হইতে পারিবে না।

হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের বিষয়াসক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বোধ হয় প্রভু বলিয়াছেন—তাঁহারা শুদ্ধ-বৈষ্ণব নহেন, যেহেতু তাঁহাদের বিষয়াসক্তি অত্যন্ত বেশী—"ইঁহার বাপ-জ্যেঠা বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া। সুখ করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥—পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ার।"

তাঁহাদের বিষয়াসক্তির একটী দৃষ্টান্ত এই শ্রীগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়রাজ যখন জানিতে পারিলেন যে হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস তাঁহাদের মোক্তা-মুলুক হইতে বিশলক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করেন, কিন্তু রাজ-সরকারে মাত্র বারলক্ষ টাকা খাজনা দেন, তখন আরও কিছু বেশী খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে তাঁহার উজীর হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধন-দাসকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত আসিলেন। কিন্তু তাঁহারা দুই ভাই-ই ভয়ে পলাইয়া গেলেন, রঘুনাথ-দাস ধরা পড়িয়া কিছু নির্য্যাতন ভোগ করিলেন। তাঁহারা যদি রাজসরকারে কিছু বেশী খাজনা দিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলেই সমস্ত গোলমাল চুকিয়া যাইত, তাঁহাদিগকে এত দুর্ভোগও ভুগিতে হইত না। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিলেন না—ইহাতেই তাঁহাদের বিষয়াসক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

রঘুনাথের সম্বন্ধে হিণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের আচরণেও তাঁহাদের বিষয়াসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গৌর-চরণে রঘুনাথের অনুরক্তিবশতঃ বিষয়সম্বন্ধে তাঁহাকে উদাসীন দেখিয়া তাঁহারা একটী পরমাসুন্দরী কিশোরীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিয়া রঘুনাথকে বিষয়াসক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন, "এইরূপ হইলে বৈষ্ণবের পক্ষে সংসার করা অসম্ভব—গৃহী বৈষ্ণবদের মধ্যে "শুদ্ধ-বৈষ্ণব" তাহা হইলে থাকিতেই পারে না।" তাহা নহে—বৈষ্ণব সংসারে থাকিতে পারেন, গৃহী-বৈষ্ণবও শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইতে পারেন। গৃহী-বৈষ্ণবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"যথাযুক্ত বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা। ২।১৬।২৩৬॥" অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগে কোনও দোষ নাই। গৃহী-বৈষ্ণবের যদি বিপুল বিষয়-সম্পত্তি থাকে, শ্রীকৃষ্ণের বিষয়-জ্ঞানে তিনি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার অনুকূল কার্য্যে তিনি তাহা নিয়োজিত করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদরূপে তিনি তাহা ভোগ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেন। অম্বরীষ মহারাজ গৃহী ছিলেন, রাজা ছিলেন; কিন্তু তিনিও শুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায়রামানন্দ, সেন-শিবানন্দ প্রভৃতিও গৃহী অথচ শুদ্ধ-বৈষ্ণব ছিলেন। বিষয়ভোগ দোষের নহে, বিষয়ে আসক্তিই দোষের।

১৯৭। **তথাপি**—পূর্ব্ব পয়ারের "যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়" এর সঙ্গে এই "তথাপির" অন্বয়।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যদিও হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধনদাস ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের অনেক সহায়তা করেন, তথাপি বিষয়ের সংশ্রবে আছেন বলিয়া বিষয়ের স্বভাব বশতঃই তাঁহাদের ভববন্ধন দৃঢ়তর হইতেছে।

বিষয়ের স্বভাব—বিষয়ের স্বরূপগত ধর্ম্ম।

মহা অন্ধ—অত্যন্ত বিবেচনাশূন্য, হিতাহিত-বিচার-ক্ষমতাহীন। বিষয়ের স্বরূপগত ধর্ম্মই এইরূপ যে, বিষয়ের সংশ্রবে বিষয়ী লোক "মহাঅন্ধ" হইয়া যায়, নিজের স্বরূপসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য হইয়া যায়; কিসে মায়াবন্ধন শিথিল হইবে, কিসে হৃদয়ে ভক্তির উন্মেষ হইবে, কিসে শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখতা জন্মিবে, এই সকল বিষয়ে কোনওরূপ বিচার করার শক্তি তাহার থাকে না, তাই কৃষ্ণভক্তির অনুকূল কোনও কাজই প্রায় বিষয়ী লোক করিতে সমর্থ হয়না; কেবল ইহাই নহে, বিষয়ের সংশ্রবে থাকাতে বিষয়েরই স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ লোক এমন সব কার্য্য করিতে উদ্যত হয়, যাহাতে তাহার সংসার-বন্ধন আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিষয়ই লোককে এসকল কার্য্য করায়। তাই হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাস বিষয়ের সংশ্রবে আছেন বলিয়া প্রভু বলিয়াছেন, তাহারা শুদ্ধ-বৈষ্ণব নহেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় যাঁহারা অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ করিতে সমর্থ, তাঁহাদের উপরে অবশ্যই বিষয়ের স্বরূপগত ধর্ম্ম কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ থাকেন। কিন্তু এরূপ ভাগ্যবান্ জীবের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সাধারণ জীব মায়িক সুখের নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতেই মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া আছে, দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া দৈহিক-সুখাদিকেই নিজের সুখ মনে করিতেছে, দৈহিক সুখাদিকেই পরম সুখ বলিয়া মনে করিতেছে এবং দৈহিক সুখের সাধন স্ত্রী-পুত্র-ধন-সম্পত্তি-আদি বিষয়কেই অত্যন্ত প্রিয়বস্তু বলিয়া মনে করিতেছে। অনাদিকাল হইতে এইরূপে বিষয়ের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া বিষয়ের সঙ্গে জীবের যেন একটা অনুকূল সম্বন্ধই জন্মিয়া গিয়াছে। তাই বিষয়ের সংশ্রবে আসিলেই তাহার বিষয়-বাসনা যেন জাগ্রত হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকের দর্শনমাত্রেই কামুক ব্যক্তির চিত্তে যেমন রমণী-সঙ্গের কামনা জন্মে, মদ দেখিলেই মদ্যাসক্তের চিত্তে যেমন পানের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে এবং নিজের আয়ত্তাধীনে মদ পাইলেই যেমন মদ্যাসক্ত ব্যক্তি মদ খাওয়ার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষয়ের সংশ্রবে আসিলেই বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্তে বিষয়-ভোগের বাসনা জাগ্রত হয় এবং নিজের আয়ত্তাধীনে কোনও বিষয় আসিলেই ঐ বিষয়ের ভোগে জীব প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহার ফল এই দাঁড়ায় যে, তার পূর্ব্বসঞ্চিত শত শত মায়াবন্ধন তো আছেই, তাহার উপর আবার বাসনা-বৈচিত্রীর প্ররোচনায় শত শত নূতন বন্ধনের সৃষ্টি হয়। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"**সেই কর্ম্ম করায়** যাতে হয় ভববন্ধ॥"

এই পয়ারের অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা ভববন্ধন হইতে মুক্তি ইচ্ছা করেন এবং যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, বিষয়ের সংশ্রব হইতে দূরে থাকাই তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত।

[বিষয়ের সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবার মত মনের অবস্থা যাঁহাদের হয় নাই, স্ত্রী-পুত্র-ধন-সম্পত্তি আদি হইতে জোর করিয়া দূরে সরিয়া গেলেও তাঁহাদের ভজনের বিশেষ আনুকূল্য হইবে বলিয়া মনে হয় না; তাহাতে বরং তাঁহাদের বিষয়ভোগের বাসনা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রবলতর হইয়া উঠিতে পারে এবং ভজনে বিশেষ বিঘ্ন জন্মাইতে পারে। অবশ্য, কোনও শক্তিধর মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে তাঁহার কৃপায় ভোগবাসনার নিরসন হইতে পারে। তাহা না হইলে বিষয়ের সংশ্রবে থাকিয়া যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ-নীতি এবং কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগ-নীতি-অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার চেষ্টা করাই বোধ হয় তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে (২।২২।৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এইভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের সঙ্গে সঙ্গে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলে এবং সংসারাসক্তি দূর করিবার নিমিত্ত ভগবচ্চরণে কাতর প্রাণে প্রার্থনা জানাইলে, ভগবৎ-কৃপায় ক্রমশঃ তাঁহাদের বিষয়াসক্তি দূর হইতে পারে। কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী বিষয়-সম্পত্তিই যাঁহার আছে, তাঁহার পক্ষে এই ভাবে জীবন-

হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা।
কহনে না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা ॥ ১৯৮

রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্র-চিত্ত হঞা— ॥ ১৯৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাত্রা নির্ব্বাহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ; অবশ্য বিষয়-সম্পত্তি বাড়াইবার নিমিত্ত যদি তিনি চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে খাল কাটিয়া কুমীর আনার মত অবস্থা হইবারই সম্ভাবনা।

আর, যাঁহার নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয় সম্পত্তি আছে, তাঁহাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি আছে বলিয়া তিনি যেন ভোগ-বিলাসাদিতে মত্ত হইয়া না উঠেন—যতটুকু না করিলে জীবন ধারণ করা যায় না, এবং লোক-সমাজে বাহির হওয়া যায় না, তাহার অতিরিক্ত যেন কিছু তিনি না করেন। "বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের, তাঁহার দাসরূপে আমি তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক মাত্র"—এই অভিমানে তিনি বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে চেষ্টা করিবেন, আর বিষয়-সম্পত্তি হইতে উৎপন্ন অর্থ নিজের ভোগে না লাগাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির অনুকূল কার্য্যে ব্যয় করিতেই সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন।

এই শ্রেণীর বিষয়ী লোকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরমকরুণ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু উপদেশ দিয়াছেন যে, পরপুরুষে আসক্তা কুলটা রমণী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিয়াও যেমন সর্ব্বদাই তাহার উপপতির সহিত সঙ্গম-সুখের কথাই চিন্তা করে, তদ্রূপ সংসারী লোক বাহিরে বিষয়-কর্ম্ম করিবে, কিন্তু তাহার মন যেন সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণচরণেই ন্যস্ত থাকে। "পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ-রসায়নম্॥—মধ্য, প্রথম-পরিচ্ছেদ-ধৃত বাশিষ্ট-রামায়ণ-বচন।" এইরূপ ভাবে চলিতে পারিলে ভগবৎ-কৃপায় শীঘ্রই বিষয়াসক্তি অন্তর্হিত হইয়া যায়; তাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥ অন্তর্নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোকব্যবহার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবেন উদ্ধার।" ২।১৬।২৩৬-৩৭।]

১৯৮। এই পয়ার রঘুনাথের প্রতি প্রভুর উক্তি।

হেন বিষয়—যে বিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তের তুল্য, যে বিষয়ের স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, ইহার সংশ্রবে আসিলেই জীব মহা অন্ধ হইয়া যায়, তাহার ভববন্ধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই বিষয়। **কহনে না যায়** ইত্যাদি—কৃষ্ণ-কৃপার মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করা যায় না।

১৯৯। **ক্ষীণতা**—কৃশতা; অনাহার ও পথের পরিশ্রমে রঘুনাথের শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছিল। **মালিন্য**—দেহের মলিনতা; রীতিমত স্নানাদির অভাবে এবং পথে রৌদ্রের তাপে রঘুনাথের দেহ মলিন হইয়া গিয়াছিল। **স্বরূপেরে কহে**—প্রভু স্বরূপ-দামোদরকে বলিলেন; যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্ত্তী দুই পয়ারে ব্যক্ত আছে। **কৃপা-আর্দ্র চিত্ত**—রঘুনাথের প্রতি কৃপা-বশতঃ চিত্ত আর্দ্র (দ্রবীভূত) হইয়াছে যাঁহার। রঘুনাথের দেহের কৃশতা ও মলিনতা দেখিয়া প্রভুর অত্যন্ত কৃপা হইল। "আহা, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত রঘুনাথ কত কষ্ট করিয়াছে; কত তাহার উৎকণ্ঠা; ইন্দ্রের তুল্য ঐশ্বর্য্য, অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে; গৃহে থাকা কালে যে কখনও মাটীতে পা ফেলিত কিনা সন্দেহ, কত উপাদেয় ভোগ্যবস্তু যাহার ভুক্তাবশেষ-রূপেও পড়িয়া থাকিত, প্রাসাদতুল্য গৃহে দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় যাহার নিদ্রার আয়োজন হইত, সেই রঘুনাথ খালি পায়ে দুর্গম পথে অনাহারে অনিদ্রায় সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া সপ্তগ্রাম হইতে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য কত তাঁহার উৎকণ্ঠা!"—ইত্যাদি ভাবিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চিত্ত রঘুনাথের প্রতি কৃপায় গলিয়া গেল।

বাস্তবিক কেবলমাত্র সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই যে ভগবৎকৃপা পাওয়া যায়, তাহা নহে সাধনের ঐকান্তিক আকুলতাই ভগবৎ-কৃপা লাভের একমাত্র হেতু। এই ঐকান্তিক আকুলতা বুঝা যায়, ভগবৎ-প্রাপ্তির সাধন যে ভজনাঙ্গ,

এই রঘুনাথে আমি সোঁপিল তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥ ২০০
তিন 'রঘুনাথ' নাম হয় আমার গণে।
'স্বরূপের রঘুনাথ' আজি হৈতে ইহার নামে॥২০১
এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিল।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈল॥ ২০২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহার অনুষ্ঠানের পরিশ্রমাদিদ্বারা। ধ্রুবের সাধন-পরিশ্রমে তাঁহার ঐকান্তিক আকুলতা দেখিয়া নারায়ণের কৃপা হইল, তিনি নারদকে ধ্রুবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দাম-বন্ধন-লীলায় যশোদা-মাতার শ্রান্তি ও ক্লান্তি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইল, তিনি বন্ধন স্বীকার করিলেন। রঘুনাথের পথশ্রান্তি-জনিত কৃশতা ও মলিনতা দেখিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হইল, তিনি তাঁহাকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করিলেন।

২০০। **এই রঘুনাথে** ইত্যাদি—প্রভু স্বরূপ দামোদরকে বলিলেন—"স্বরূপ! রঘুনাথকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; আজ হইতে রঘুনাথ তোমার; তুমি নিজের পুত্রজ্ঞানে, নিজের ভৃত্যজ্ঞানে ইঁহাকে গ্রহণ করিবে, ইহাই আমার অনুরোধ।"

পুত্রভৃত্যরূপে—পুত্ররূপে এবং ভৃত্যরূপে। পিতার ঐকান্তিক স্নেহের পাত্র হয় পুত্র; আবার পিতার সম্পত্তির অধিকারীও হয় পুত্র; পিতা তাঁহার সমস্ত উত্তম সম্পত্তিই রাখিয়া যায়েন পুত্রের জন্য এবং সেই সম্পত্তি রক্ষা করার কৌশলও পিতাই পুত্রকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আর ভৃত্যের কার্য্য হইল সেবাদিদ্বারা প্রভুর প্রীতি সম্পাদন; প্রভুরও কার্য্য হইল ভৃত্যকে নিজের সেবা দেওয়া এবং সর্ব্বতোভাবে ভৃত্যের পালন করা। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিলেন—"স্বরূপ, এই রঘুনাথকে তুমি তোমার পুত্ররূপে এবং ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার কর। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ তোমার যে অতুলনীয় ধনসম্পত্তি আছে, রঘুনাথকে সেই ধনের অধিকারী করিয়া লও এবং কি উপায়ে সেই ধন প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জ্জন করা যায়, কিরূপে সেই ধন রক্ষা করা যায়, তুমি রঘুনাথকে তাহা শিক্ষা দাও। রঘুনাথকে তুমি তোমার সেবা করিতে দিও (ভঙ্গীতে রঘুনাথকেও বলিলেন,—তুমি স্বরূপের সেবা করিও)। স্বরূপ, তুমি রঘুনাথকে সর্ব্বতোভাবে পালন করিও।" এস্থলে পালন বলিতে দেহের পালনই প্রভুর অভিপ্রেত নয়; ভক্তির পালনই অভিপ্রেত—কিরূপে রঘুনাথের চিত্তে ভক্তি পুষ্টি লাভ করিতে পারে, কিরূপে সেই ভক্তি রক্ষিত হইতে পারে, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টিই হইতেছে বাস্তবিক পালন।

প্রভুর এই সমস্ত উক্তিতে রঘুনাথের প্রতি তাঁহার অপরিসীম করুণাই সূচিত হইতেছে।

২০১। **তিন রঘুনাথ**—তপনমিশ্রের পুত্র এক রঘুনাথ, রঘুনাথ-বৈদ্য দ্বিতীয় রঘুনাথ, আর রঘুনাথ দাস তৃতীয় রঘুনাথ। এই তিন জনের মধ্যে ঐদিন হইতে রঘুনাথ দাসের নাম হইল "স্বরূপের রঘুনাথ"; "স্বরূপের রঘুনাথ" বলিলে রঘুনাথ দাসকেই বুঝাইত।

আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে প্রেমকল্পতরুর শ্রীচৈতন্যরূপ মুখ্যশাখার নাম-বিবরণে প্রভুর গণের মধ্যে উক্ত তিনজন রঘুনাথের নামই পাওয়া যায়। "রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস (১।১০।১২৪)॥ রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—মিশ্রের নন্দন॥ (১।১০।১৫১)॥" শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর গণের মধ্যেও এক রঘুনাথের নাম পাওয়া যায়; "রঘুনাথবৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।১।১১।১৯॥" আবার শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর গণেও এক রঘুনাথের নাম পাওয়া যায়। "পুরুষোত্তম পণ্ডিত আর রঘুনাথ।১।১২।৬১॥" কিন্তু এই দুই রঘুনাথের কেহই সাক্ষাদ্‌ভাবে মহাপ্রভুর গণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত হয়েন নাই।

২০২। রঘুনাথের হাতে ধরিয়া প্রভু নিজেই যেন আগে তাঁহাকে অঙ্গীকার করিলেন। তারপর শ্রীস্বরূপ-দামোদরের হস্তে অর্পণ করিয়া প্রভু যেন জানাইলেন—"স্বরূপ, আমার এই রঘুনাথের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমি তোমার হস্তেই অর্পণ করিলাম।"

স্বরূপ কহে—মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল।
এত কহি রঘুনাথে পুন আলিঙ্গিল ॥ ২০৩
চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি— ॥ ২০৪
পথে ইহোঁ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কথোদিন কর ইহাঁর ভাল সন্তর্পণ ॥ ২০৫
রঘুনাথে কহে—যাই কর সিন্ধুস্নান।
জগন্নাথ দেখি আসি করহ ভোজন ॥ ২০৬
এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথদাস সব ভক্তেরে মিলিলা ॥ ২০৭

রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ।
বিস্মিত হঞা করে তাঁর ভাগ্য-প্রশংসন ॥ ২০৮
রঘুনাথ সমুদ্রে যাই স্নান করিলা।
জগন্নাথ দেখি পুন গোবিন্দপাশ আইলা ॥ ২০৯
প্রভুর অবশিষ্টপাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল।
আনন্দিত হঞা রঘুনাথ প্রসাদ পাইল ॥ ২১০
এইমত রহে তেঁহো স্বরূপ-চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দিল পঞ্চদিনে ॥ ২১১
আরদিন হৈতে পুষ্প-অঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া ॥ ২১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২০৩। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কৃপা করিয়া স্বহস্তে রঘুনাথদাসের হাত ধরিয়া যখন স্বরূপদামোদরের হস্তে অর্পণ করিলেন, তখন স্বরূপ প্রভুর অভিপ্রায়-অনুসারে রঘুনাথকে অঙ্গীকার করিলেন এবং আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় অঙ্গীকার জানাইলেন।

২০৪। **গোবিন্দ**—প্রভুর সেবক গোবিন্দ; **রঘুনাথে দয়া করি**—রঘুনাথের প্রতি দয়া করিয়া (প্রভু গোবিন্দকে বলিলেন)।

২০৫। এই পয়ার গোবিন্দের প্রতি প্রভুর উক্তি। **ইহোঁ**—রঘুনাথ। **লঙ্ঘন**—উপবাস। **কথোদিন**—কয়েক দিন। **ভাল সন্তর্পণ**—ভাল রূপে আহারাদি দিয়া বিশেষ রূপে তৃপ্তি।

২০৮। **বিস্মিত হঞা**—রঘুনাথের প্রতি প্রভুর অসাধারণ কৃপা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

২১০। **অবশিষ্ট পাত্র**—ভুক্তাবশেষ।

২১১। **গোবিন্দ প্রসাদ** ইত্যাদি—গোবিন্দ রঘুনাথকে পাঁচ দিন মাত্র প্রসাদ দিয়াছিলেন। নীলাচলে উপস্থিত হওয়ার পরে প্রথম পাঁচ দিন মাত্র রঘুনাথ গোবিন্দের নিকটে প্রসাদ পাওয়ার নিমিত্ত গিয়াছেন; পাঁচ দিনের পরে তিনি ইচ্ছা করিয়াই গোবিন্দের নিকটে যাইতেন না।

২১২। "আর দিন হৈতে" হইতে "কৃপাত করিয়া" পর্য্যন্ত তিন পয়ার। রঘুনাথ দাস নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর; তাঁহার সাধনের, বা সাধনের অনুকূল বৈরাগ্যের কোনও প্রয়োজনই ছিলনা। তথাপি মায়াবদ্ধ জীবের নিমিত্ত ভজনের আদর্শ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে প্রভু রঘুনাথের মধ্যে সাধারণ জীব-ভাব প্রকট করিয়াছেন। সংসারী জীবের মধ্যে যিনি ভজনে যত উচ্চ অধিকারী, তিনিই নিজেকে তত বেশী অযোগ্য, তত বেশী অধম মনে করেন, নিজের শক্তির উপরে তাঁহার আস্থা ততই অধিক রূপে লোপ পাইতে থাকে। তাই রঘুনাথ দাস পাঁচ দিন পর্য্যন্ত গোবিন্দের দেওয়া প্রভুর অবশেষ-পাত্র পাইলেন, পাইয়া বোধ হয় তিনি এরূপ বিচার করিলেন :—"আমি মায়াবদ্ধ জীব, অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ভুলিয়া দেহের সেবাতেই মত্ত হইয়া আছি, দেহের সুখানুসন্ধানেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত আছি। কিন্তু যত দিন আত্ম-সুখানুসন্ধান থাকিবে, তত দিন কৃষ্ণ-কৃপার কোনও আশাই নাই। শিশুকাল হইতেই স্নেহশীল পিতা-মাতা-জ্যেঠা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনের আদর-যত্নে প্রচুর পরিমাণে সুখভোগ করিয়া আসিতেছি। প্রভুর কৃপায় গৃহ ছাড়িয়া এখানে আসিলাম, প্রভুর অবশেষ পাইয়া কৃতার্থ হইলাম; সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দের আদর-যত্নও পাইতে লাগিলাম। বাড়ীতে যে ভাবে ছিলাম, এখানেও প্রায় তেমনই—তেমনি আদর-যত্ন, তেমনি অনায়াস-

জগন্নাথের সেবক, যত বিষয়ীর গণ।
সেবা সারি রাত্র্যে করে গৃহেরে গমন ॥ ২১৩
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।
পসারির ঠাঞি অন্ন দেয়ায় কৃপা ত করিয়া ॥২১৪
এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহারে।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বারে ॥ ২১৫
সর্ব্বদিন করে বৈষ্ণব নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ-দরশন ॥ ২১৬
কেহো ছত্রে মাগি খায় যেবা কিছু পায়।
কেহো রাত্র্যে ভিক্ষা-লাগি সিংহদ্বারে রয় ॥ ২১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লব্ধ আহার্য্য। কিন্তু এই ভাবে আদর-যত্ন ও অনায়াস-লব্ধ আহার্য্য পাইতে থাকিলে আমার চিরকালের অভ্যস্ত আত্মসুখ-স্পৃহা—প্রভুর কৃপায় যাহাতে একটু ভাটা পড়িয়াছে—সেই আত্মসুখ-স্পৃহায় আবার জোয়ার আসিতে পারে; এই জোয়ারের মুখে,—এখন যে কৃষ্ণভক্তি লাভের নিমিত্ত একটু ক্ষীণ ইচ্ছা জন্মিয়াছে—তাহাও হয়ত বহু দূরে ভাসিয়া যাইতে পারে। সুতরাং গোবিন্দের এই আদর-যত্ন হইতে আমাকে দূরে সরিয়া থাকিতে হইবে, অনায়াস-লব্ধ মহাপ্রসাদের অপেক্ষায় আর এখানে থাকিলে আমার চলিবে না।" এসব ভাবিয়াই বোধ হয় রঘুনাথ অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। ষষ্ঠ দিন হইতে, সমস্ত দিন নিজে ভজন করিতেন, আর শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন, দিনের মধ্যে আর খাওয়া দাওয়ার কোনও চেষ্টাই করিতেন না। অধিক রাত্রিতে যখন শ্রীজগন্নাথের শয়ন হইয়া যাইত, তখন আর দর্শনের সুযোগ থাকিত না বলিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিতেন; আসিয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইতেন। জগন্নাথের সেবকগণ সেবার কার্য্য সমাধা করিয়া সিংহদ্বার দিয়া গৃহে ফিরিবার সময়ে রঘুনাথকে দেখিলে যদি কাহারও দয়া হইত, তবে তিনি মহাপ্রসাদের দোকান হইতে কিছু মহাপ্রসাদ লইয়া তাঁহাকে দিতেন; তাহা আহার করিয়াই রঘুনাথ তৃপ্তি অনুভব করিতেন। বিশলক্ষ টাকা আয়ের সপ্তগ্রাম-মুলুকের একমাত্র উত্তরাধিকারী রঘুনাথ-দাস এই ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

আর দিন হইতে—প্রথম পাঁচদিনের পর হইতে। **পুষ্প-অঞ্জলি**—শ্রীজগন্নাথের চরণে পুষ্পাঞ্জলি; রাত্রিতে এই পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়; ইহাই শ্রীজগন্নাথের শেষ সেবা; ইহার পরেই শয়ন দেওয়া হয়, সুতরাং আর দর্শন পাওয়া যায় না। **সিংহদ্বার**—শ্রীজগন্নাথের অঙ্গনের পূর্ব্বদিকস্থ সদর-দ্বার। **খাড়া রহে**—দাঁড়াইয়া থাকেন।

২১৩। **বিষয়ীর গণ**—যাঁহারা স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে আছেন, সুতরাং শ্রীজগন্নাথের সেবার কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহকার্য্যাদির অনুরোধে যাঁহারা নিজ নিজ গৃহে গমন করেন।

কোনও কোনও গ্রন্থে "যত বিষয়ীর গণ" স্থলে "আর বিষয়ীর গণ" পাঠ আছে। এইরূপ পাঠান্তর-স্থলে এই পয়ারার্দ্ধের অর্থ এইরূপ হইবে:—জগন্নাথের সেবকগণ এবং যে সমস্ত বিষয়ী (সংসারী) লোক শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে গিয়াছিলেন, তাঁহারা।

সেবা সারি—শ্রীজগন্নাথের সেবার কার্য্য সমাধা করিয়া।

২১৪। **অন্নার্থী বৈষ্ণব**—যে বৈষ্ণব প্রসাদান্ন পাওয়ার আশায় দাঁড়াইয়া আছেন।

পসারি—মহাপ্রসাদ-বিক্রেতা দোকানদার।

২১৫-১৭। "এইমত সর্ব্বকাল" হইতে "সিংহদ্বারে রয়" পর্য্যন্ত তিন পয়ার। কেবল রঘুনাথ দাসই যে ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকিতেন, তাহা নহে। অনেক নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবই এইরূপ আচরণ করিতেন। আবার কেবল মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসের সময়েই যে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ এইভাবে ভিক্ষার্থী হইতেন, তাহাও নহে। সকল সময়েই, নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ সমস্ত দিন নাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন, যথেচ্ছভাবে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন; আহারের জন্য কেহ বা দিনে ছত্রে যাইয়া যাহা কিছু পায়েন, তাহা খাইয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন, রাত্রিতে আর আহার করেন না;

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর ভগবান্ ॥ ২১৮
গোবিন্দ প্রভুকে কহে—রঘুনাথ প্রসাদ না লয়।
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হৈয়া মাগি খায় ॥ ২১৯
শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা—।
ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা ॥ ২২০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আবার কেহ বা সমস্ত দিন কিছুই আহার করেন না, আহারের কোনও চেষ্টাও করেন না, রাত্রিতে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া যাহা কিছু পায়েন, তাহা খাইয়াই তৃপ্তিলাভ করেন।

নিষ্কিঞ্চন ভক্ত—যিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের উদ্দেশ্যে স্ত্রী-পুত্র-বিষয়-সম্পত্তি ছাড়িয়া কাঙ্গাল সাজিয়াছেন এবং যখন যাহা কিছু মিলে, তাহা আহার করিয়াই তৃপ্তি লাভ করতঃ ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ২।২২।৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ছত্র—অন্নদানের স্থান; অন্নসত্র।

২১৮। **বৈরাগ্য**—কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ। শুষ্ক বৈরাগ্য নহে; কেবল বৈরাগ্যের জন্য যে বৈরাগ্য, তাহাও নহে।

বৈরাগ্য প্রধান—মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যে কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। অন্য সাধকদের মধ্যেও বৈরাগ্য থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা সাধারণতঃ শুষ্ক বৈরাগ্য, বৈরাগ্যের জন্যই বৈরাগ্য। কিন্তু গৌরভক্তদের বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি বা শ্রীগৌরপ্রীতি হইতেই ইহার উদ্ভব; ইহা যথেষ্ট আয়াস হইতে লব্ধ নয়, ইহা অনায়াস-লব্ধ। যতটুকু কৃষ্ণপ্রীতি বা গৌরপ্রীতি হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, ততটুকু বৈরাগ্য আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে। গৌরভক্তের চেষ্টা হয় গৌর-প্রীতির পুষ্টির জন্য, বৈরাগ্য লাভের জন্য তাঁহার স্বতন্ত্র চেষ্টা বিশেষ থাকেনা। স্বতন্ত্র চোষ্টার সার্থকতাও বিশেষ নাই। নিজের চেষ্টায় কেহ অমানিশার অন্ধকার দূর করিতে পারেনা; তাহাকে সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়; সূর্য্যোদয় হইলেই অন্ধকার দূর হইয়া যায়; সূর্য্যের আলোক যত বেশী বিকীর্ণ হইবে, অন্ধকারও তত বেশী দূরীভূত হইবে। তদ্রূপ, নিজের ইচ্ছায় বা চেষ্টাতেই কেহ বিষয়াসক্তি দূর করিতে পারেনা; এই আসক্তি হইল বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাব; জীবের কোনও সামর্থ্যই নাই, যদ্দ্বারা এই মায়াকে দূর করিতে পারা যায়। মায়াকে দূর করিতে পারেন—একমাত্র স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ ভক্তি বা প্রীতি। এই ভক্তির বা প্রীতির উন্মেষ যত বেশী হইবে, সংসারাসক্তিও ততই তিরোহিত হইবে। যাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণাশ্রিত, গৌরের অসাধারণ কৃপাধারা তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হয়; তাহারই প্রভাবে তাঁহাদের চিত্তে গৌর-প্রীতি পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে; তাই তাঁহাদের মধ্যে অনায়াস-লব্ধ-বৈরাগ্য প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মত কৃপার অভিব্যক্তি অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপে নাই। আরও একটী গূঢ় রহস্যও বোধহয় আছে। "রসরাজ-মহাভাব-দুইয়ে একরূপ" শ্রীশ্রীগৌরের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যে গৌরভক্তদের চিত্ত এতই আকৃষ্ট হয় যে, অপর কোনও বিষয়ের অনুসন্ধানই আর তাঁহাদের থাকেনা; তাই তাঁহাদের মধ্যে বৈরাগ্য প্রধান।

যাহা দেখি ইত্যাদি—গৌরভক্তদের বৈরাগ্য হইল তাঁহাদের গৌরপ্রীতির বা কৃষ্ণপ্রীতির পরিচায়ক। তাঁহাদের বৈরাগ্য-লক্ষিত কৃষ্ণপ্রীতি দেখিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীতি অনুভব করেন।

২২০। রঘুনাথের আচরণের কথা গোবিন্দ যাইয়া মহাপ্রভুর নিকট বলিলেন। শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। প্রভু বলিলেন—"রঘুনাথ বেশ উত্তম কাজই করিতেছে; ইহাই নিষ্কিঞ্চনের কর্ত্তব্য।"

বৈরাগীর ধর্ম্ম—নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।

বৈরাগী করিব সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ ॥ ২২১

বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ ২২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২১। "বৈরাগী করিব" হইতে "কৃষ্ণ নাহি পায়" পর্য্যন্ত পাঁচ পয়ারে প্রভু নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের কি কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছেন।

বৈরাগী করিব ইত্যাদি—সর্ব্বদা অবিচ্ছেদে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করাই নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। আহারের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হওয়া, বা কোনও একস্থানে স্থায়িভাবে আহারের সংস্থান করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে; তবে ভজনের নিমিত্ত বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন; বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কিছু আহারেরও প্রয়োজন। তাই মাগিয়া যাচিয়া যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করিতে হইবে, তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিয়া সর্ব্বদা প্রসন্ন চিত্তে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে।

ভিক্ষালব্ধ আহার্য্যের উপকারিতা অনেক। প্রথমতঃ, ভিক্ষার্থীর চিত্তে কোনওরূপ অহঙ্কারের উদ্রেক হইতে পারে না; তাহার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়, নিজের সম্বন্ধে তাহার হীনতা জ্ঞান জন্মে, তাহার পক্ষে "তৃণাদপি সুনীচ" হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভিক্ষার সময়েও নাম-সঙ্কীর্ত্তন চলিতে পারে; সুতরাং উদরান্নের সংস্থানের জন্য তাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভজন ত্যাগ করিতে হয় না। তৃতীয়তঃ, ভিক্ষা পরাপেক্ষা ছাড়াইয়া একমাত্র ভগবানে মনের নিষ্ঠা জন্মাইয়া দেয়। চতুর্থতঃ, দানের বস্তু যদি অত্যন্ত বেশী হয়, তাহা হইলে দাতার মনে অহঙ্কার ও দম্ভাদি জন্মিতে পারে; দাতার মানসিক ভাবের দ্বারা ঐ দানের বস্তু দূষিত হইয়া যায়; সেই বস্তু গ্রহণ করিলে দান-গ্রহণকারীর চিত্তও কলুষিত হইয়া যায়; আবার বেশী বস্তু দান করার ক্ষমতাও অনেকের নাই, তথাপি লোক-লজ্জা বা চক্ষু-লজ্জার বশীভূত হইয়া, কিম্বা যাচকের অনুরোধে, উপরোধে বাধ্য হইয়া কেহ কেহ সাধ্যাতীত ভাবেও দান করিয়া থাকেন; এইরূপ দানে দাতার চিত্তে একটু কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা; তাহাতে দানের বস্তুও দূষিত হইয়া পড়ে; এইরূপ বস্তু গ্রহণ করিলেও যাচকের চিত্ত কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু একমুষ্টি চাউল দিতে প্রায়ই কাহারও কষ্ট হয় না, কাহারও চিত্তে দম্ভ-অহঙ্কার জন্মিবার সম্ভাবনাও থাকে না। তাই মুষ্টি-ভিক্ষায় অন্নদাতার মনের ভাব দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য, যাহারা একমুষ্টি চাউল দিতেও অক্ষম, কিম্বা একমুষ্টি চাউল দিয়াও যাহারা দম্ভ-অহঙ্কারাদি প্রকাশ করে, তাহাদের নিকটে মুষ্টিভিক্ষা যাচ্ঞা করাও বোধ হয় সাধকের ভজনের অনুকূল হইবে না। যাহা প্রীতির দান, তাহাই উত্তম।

২২২। **পরাপেক্ষা**—উদরান্নের নিমিত্ত পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা। **কার্য্যসিদ্ধি**—অভীষ্ট-সিদ্ধি, বাঞ্ছিত বস্তুলাভ। এস্থলে কার্য্যসিদ্ধি বলিতে বোধ হয় কৃষ্ণপ্রেম লাভকেই বুঝাইতেছে; কারণ, বৈরাগীর কার্য্যসিদ্ধি বলিতে অপর কোনও বস্তুকেই বুঝাইতে পারে না—বৈরাগীর অভীষ্ট-বস্তুই হইল কৃষ্ণপ্রেম।

বৈরাগী হইয়া ইত্যাদি—যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের উদ্দেশ্যেই সংসার-ত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চনের বেশ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি উদর-নির্ব্বাহের নিমিত্ত অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন, তবে ভজনে অগ্রসর হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপেক্ষা করেন; কারণ, যিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কৃপার উপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকেন, আশ্রিত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই কৃপা করেন; আর যে ব্যক্তি নিজের দেহের ভরণ পোষণের নিমিত্ত অপরের অপেক্ষা করে, শ্রীকৃষ্ণের উপরে যে তাহার সম্পূর্ণ নির্ভরতা নাই, শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় যে তাহার বিশেষ আস্থা নাই, তাহার আচরণে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার উপরে যাহার সম্যক্ আস্থা নাই, শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে সম্যক্ কৃপা করেন না; কারণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাই এই যে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্—গীতা।" যিনি শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে সেই ভাবে কৃপা করেন; শ্রীকৃষ্ণের উপরে যাঁহার সম্যক্ নির্ভরতা আছে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাও তাঁহার প্রতি সম্যক্‌রূপে প্রকটিত হয়; আর শ্রীকৃষ্ণের উপরে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

যাহার সম্যক্ নির্ভরতা নাই, তাঁহার কৃপাও তাহার বিষয়ে সম্যক্ প্রকটিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার সম্যক্ প্রাকট্যাভাবকেই শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বলা হইয়াছে।

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, কৃপা-বিতরণে শ্রীকৃষ্ণের তবে পক্ষপাতিত্ব আছে? না, তাহা নাই; শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ-পাতিত্ব থাকিতে পারে না। সূর্য্য যেমন পৃথিবীস্থ সকল বস্তুর উপরে সমভাবেই তাপ-বিতরণ করিতেছেন, কিন্তু তাপ-গ্রহণের যোগ্যতার তারতম্য-অনুসারে কোনও বস্তু অধিক উত্তপ্ত হয়, কোনও বস্তু কম উত্তপ্ত হয়, আবার কোনও বস্তু হয়তো মোটেই উত্তপ্ত হয় না; সেইরূপ পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ সকল জীবের নিমিত্তই তাঁহার করুণার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, গ্রহণের যোগ্যতা-অনুসারে জীব তাহা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকে। অথবা, স্নেহময়ী জননী তাঁহার সন্তানদিগের রুচি, প্রকৃতি ও শরীরের অবস্থা বিবেচনায় যেমন তাহাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আহার্য্যের যোগাড় করিয়া থাকেন, তাহাতে যেমন কোনও সন্তানের প্রতিই মাতার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইতে পারেনা, তদ্রূপ পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণও জীবের রুচি, প্রকৃতি ও চিত্তের অবস্থাভেদে তাহাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁহার কৃপা প্রকট করিয়া থাকেন; ইহাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব কিছুই নাই; পূর্ণবয়স্ক লোকের যেরূপ আহার্য্যের প্রয়োজন, যেরূপ বস্ত্রাদির প্রয়োজন, পাঁচমাসের শিশুর পক্ষে তাহার কোনও প্রয়োজনই নাই, তাহা বরং তাহার পক্ষে অনিষ্টকরই হইয়া থাকে।

সূর্য্যরশ্মি সকল কাচেই পতিত হইতে পারে; যে কাচের মধ্যস্থল স্থূল, তাহাতে পতিত হইলে রশ্মিগুলি একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া ঔজ্জ্বল্য ও দাহিকাশক্তি ধারণ করে; তাহাতে কোনও দাহ্য বস্তু স্থাপন করিলে তাহা দগ্ধ হইয়া যায়। অন্য কাচে এইরূপ হয় না। ইহা সূর্য্যের পক্ষ-পাতিত্বের ফল নহে; ইহা হইতেছে—কাচের সূর্য্যরশ্মি গ্রহণের যোগ্যতার তারতম্যের ফল। ভক্তের চিত্ত স্থূলমধ্য কাচের তুল্য; তাহাতে ভগবানের কৃপারশ্মি কেন্দ্রীভূত হইয়া এক বৈশিষ্ট্য ধারণ করিয়া থাকে। অভক্তের চিত্তের তদ্রূপ যোগ্যতা নাই। ইহাতেও ভগবানের পক্ষপাতিত্ব কিছু নাই। শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন মে প্রিয়ঃ। যে ভজন্তিতু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ গীতা। ৯।২৯॥—সকল জীবই আমার পক্ষে সমান; আমার দ্বেষ্যও কেহ নাই, আমার প্রিয়ও কেহ নাই। কিন্তু যিনি ভক্তিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত, আমিও তাঁহাতে আসক্ত।" সকলের প্রতি সমান ভাব (বা সমান কৃপা)—ইহা হইল যেন সাধারণ বিধি (সূর্য্যের পক্ষে সমভাবে কিরণ-বিতরণের ন্যায় সাধারণ বিধি); কিন্তু অকপট ভক্তের সম্বন্ধে একটা বিশেষ বিধিও আছে। ভক্ত ভগবানে আসক্ত, অভক্ত তাঁহাতে আসক্ত নহে; ইহা হইল অপর লোক অপেক্ষা ভক্তের বৈশিষ্ট্য (যেমন সূর্য্যরশ্মি-গ্রহণ সম্বন্ধে অপর কাচ অপেক্ষা স্থূলমধ্য কাচের বৈশিষ্ট্য)। ভক্তের এই বৈশিষ্ট্যের ফলে ভক্তসম্বন্ধে ভগবানেরও একটা বৈশিষ্ট্য জন্মে; তাহা হইতেছে এই:—ভগবানও ভক্তের প্রতি আসক্ত—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই নীতি অনুসারে। ভক্তির ভগবদ্-বশীকরণী শক্তি আছে। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ—শ্রুতি। ভক্তির এই শক্তিবশতঃই ভগবান্ ভক্তের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়েন। ভক্তব্যতীত অপরের মধ্যে ভগবদ্-বশীকরণী শক্তিসম্পন্না ভক্তি নাই বলিয়া ভক্তব্যতীত অপরের প্রতি ভগবানের আসক্তির উন্মেষ হইতে পারে না। ইহা হইল ভক্তির স্বরূপগত ধর্ম্মের বা বস্তুগত শক্তির প্রভাব; সুতরাং ইহা দ্বারাও ভক্তের প্রতি ভগবানের পক্ষপাতিত্ব প্রমাণিত হয় না। ইহা হইল—ভক্তির প্রভাবে ভক্ত-চিত্তের বৈশিষ্ট্যের ফল। এই বৈশিষ্ট্যই ভক্তের প্রতি ভগবানের আসক্তি জন্মায় এবং ভক্তের প্রতি ভগবানের এই আসক্তির নামই ভগবানের ভক্তবাৎসল্য। ভগবানের এই ভক্তবাৎসল্যকে যদি কেহ তাঁহার ভক্ত-পক্ষপাতিত্ব আখ্যা দিতে চাহেন, তাহা হইলেও ইহা দোষের কথা নহে। ভক্তবাৎসল্য হইতেছে ভগবানের একটী বিশেষ ভজনীয় গুণ। তাঁহাতে এই গুণ আছে বলিয়াই তিনি বলিয়া থাকেন—"যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥ (১।১।২৫-শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য)।

বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় তার, হয় রসের বশ ॥ ২২৩
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নামসঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥ ২২৪
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥ ২২৫
আরদিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে।
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে—॥ ২২৬
'কি-লাগি ছাড়াইলে ঘর, না জানোঁ উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য প্রভু! কর উপদেশ ॥' ২২৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ (১।১।৩০-শ্লোকের টীকাদি দ্রষ্টব্য)। অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ শ্রীভা, ৯।৪।৬৩ ॥"

২২৩। জিহ্বার লালসা—আহার্য্যের জন্য লালসা। **পরমার্থ**—অভীষ্টবস্তু, কৃষ্ণপ্রেম। **রসের বশ**—ভোজ্যরসের বশীভূত।

আহার্য্যবস্তুর প্রতিই যাহার প্রবল লোভ, ঐ বস্তুতেই তাহার আবেশ জন্মে, ক্রমশঃ দৈহিক সুখের নিমিত্তই তাহাকে সর্ব্বদা বিব্রত হইতে হয়; এইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখের নিমিত্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর (রসের) অনুসন্ধানেই তাহাকে ছুটাছুটি করিতে হয়, পরমার্থের অনুসন্ধান বহু দূরে সরিয়া পড়ে।

২২৪। এই পয়ারে আবার বৈরাগীর কর্ত্তব্যের কথা বলিতেছেন।

শাক-পত্র ইত্যাদি—কেবল উদর-ভরণের নিমিত্তই বৈরাগী ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবেন না; তিনি সর্ব্বদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিবেন, আর যখন যাহা জুটে, সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদ্বারাই ক্ষুধা নিবারণ করিবেন; মাগিয়া যাচিয়াও যদি কিছু না জুটে, তাহা হইলে অরণ্যজাত শাক, পাতা, ফল, মূল খাইয়া জীবনধারণ করিবেন, তথাপি পরের মুখাপেক্ষী হইবেন না।

২২৫। ইতি-উতি ধায়—এখানে ওখানে ছুটাছুটি করে। **শিশ্ন**—সন্তান-উৎপাদক ইন্দ্রিয়; উপস্থ। **শিশ্নোদর-পরায়ণ**—কামুক ও পেটুক। খাওয়ার নিমিত্ত এবং স্ত্রী-সঙ্গের নিমিত্ত যাহার বলবতী বাসনা আছে, তাহাকে শিশ্নোদর-পরায়ণ বলে। এইরূপ ব্যক্তি কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিতে পারে না। সংসারাসক্ত জীবে যত রকম বাসনা আছে, তন্মধ্যে ভাল খাওয়ার বাসনা এবং স্ত্রী-সঙ্গের বাসনাই প্রধান। এই দুইটী দুর্দ্দমনীয়া বাসনার তাড়নাতেই জীব সংসারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু কেবলমাত্র জড়দেহের সঙ্গেই এই দুইটী বাসনার সম্বন্ধ, জীবস্বরূপের সঙ্গে ইহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই, ভগবৎ-প্রীতির সঙ্গেও ইহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই দুইটী বাসনার পরিপোষণই দুঃসঙ্গ, সুতরাং আত্মবঞ্চনা। "দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম-বঞ্চনা। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-ভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥ ২।২৪।৭০ ॥" এই দুইটী বাসনা যতদিন হৃদয়ে থাকিবে, ততদিন ভক্তির কৃপালাভের কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না; "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৫ ॥" এজন্য বলা হইয়াছে, "শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।"

২২৬। কৃত্য—কর্ত্তব্য।

২২৭। এই পয়ার রঘুনাথের উক্তি। **স্বরূপদামোদরের** নিকটেই রঘুনাথ এই কথা কয়টী বলিলেন। পয়ারে যে "প্রভু" শব্দটী আছে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। "প্রভু ঘরবাড়ী ছাড়াইয়া কেন আমাকে বাহির করিয়া আনিলেন, তাহা তো আমি জানি না। এখন আমার কর্ত্তব্যই বা কি, তাহাও জানি না; প্রভু কৃপা করিয়া আমায় কর্ত্তব্যের উপদেশ দিউন, ইহাই প্রার্থনা।' ইহাই রঘুনাথের উক্তির মর্ম্ম। স্বরূপের নিকট বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন কৃপা করিয়া এই কথা কয়টী প্রভুর চরণে নিবেদন করেন।

প্রভু-আগে কথা মাত্র না করে রঘুনাথ।
স্বরূপ-গোবিন্দ-দ্বারা কহায় নিজ বাত ॥ ২২৮
প্রভু-আগে স্বরূপ নিবেদিল আরদিনে—।
রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে—॥২২৯
'কি মোর কর্ত্তব্য, মুঞি না জানোঁ উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে মোর কর উপদেশ॥' ২৩০
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল—।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল ॥ ২৩১
সাধ্যসাধন-তত্ত্ব শিখ ইঁহাস্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে ॥ ২৩২
তথাপি আমার আজ্ঞায় শ্রদ্ধা যদি হয়।
আমার এই বাক্য তবে করিহ নিশ্চয়—॥ ২৩৩
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥ ২৩৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২২৮। স্বরূপ গোবিন্দ দ্বারা—স্বরূপদামোদরের দ্বারা এবং গোবিন্দ দ্বারা। সঙ্কোচবশতঃ রঘুনাথ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিকটে নিজে কোনও কথাই বলিতেন না; প্রভুর চরণে যদি কিছু বলিবার প্রয়োজন হইত, তিনি তাহা গোবিন্দের নিকটে, অথবা স্বরূপদামোদরের নিকটে বলিতেন এবং প্রভুর চরণে তাহা নিবেদন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেন; তাঁহারাই রঘুনাথের কথা প্রভুর চরণে জ্ঞাপন করিতেন। ৩।৬।১২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৯। স্বরূপদামোদর রঘুনাথের কথা শুনিলেন; শুনিয়া একদিন রঘুনাথকে সঙ্গে করিয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"প্রভুর চরণে রঘুনাথের একটী নিবেদন আছে।" এই নিবেদনটী পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

২৩৪। "গ্রাম্যকথা না শুনিবে" হইতে "মানসে করিবে" পর্য্যন্ত দুই পয়ারে রঘুনাথের প্রতি প্রভুর উপদেশ। "গ্রাম্যকথা না শুনিবে" ইত্যাদি পয়ারে ভজনের অনুকূল বাহ্যিক আচরণের উপদেশ দিতেছেন।

গ্রাম্যকথা—"গ্রাম্যকথা" বলিতে সাধারণতঃ স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় বা স্ত্রী-সঙ্গ সম্বন্ধীয় কথাকেই বুঝায়। গ্রাম্যকথার উপলক্ষণে এস্থলে, যে সকল কথার সঙ্গে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুর কোনও সম্বন্ধ নাই, সে সকল কথাকেই বুঝাইতেছে। ২।২২।৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রভু বলিলেন, "রঘুনাথ, কখনও গ্রাম্য-কথা শুনিবে না, কখনও গ্রাম্যকথা বলিবেও না"; কারণ, গ্রাম্যকথা শুনিলে বা বলিলে মন ক্রমশঃ গ্রাম্যবিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে পারে, সুতরাং ভগবদ্-বহির্ম্মুখ হইয়া পড়িতে পারে। এই উপদেশের ধ্বনি এই যে, যেস্থানে গেলে গ্রাম্যকথা শুনার সম্ভাবনা আছে, তেমন স্থানেও যাইবে না। গ্রাম্যবার্ত্তা-ভয়ে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী কাহারও সঙ্গ করিতেন না—"গ্রাম্যবার্ত্তাভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গহীন। ২।৪।১৭৭॥"

প্রভু আরও বলিলেন, "রঘুনাথ, ভাল জিনিস খাইবে না এবং ভাল কাপড় পরিবে না।" ভাল জিনিস বলিতে এস্থলে সুস্বাদু উপাদেয় জিনিসকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; আর ভাল কাপড় বলিতে বিলাসিতাদ্যোতক সুন্দর বস্ত্রাদিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভাল জিনিস খাইতে খাইতে বা ভাল কাপড় পরিতে পরিতে যথালাভে তৃপ্তির সম্ভাবনা দূরীভূত হইয়া যায়; ক্রমশঃ এমন একটা অভ্যাস জন্মিয়া যায়, যখন আর মন্দ খাদ্য খাইতে বা মন্দ কাপড় পরিতে ইচ্ছা হয় না। ভাল খাদ্যে ও ভাল কাপড়ে আবেশ জন্মিয়া গেলে দৈহিক সুখের দিকেই মন ধাবিত হইবে, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে মনকে নিবিষ্ট রাখা সম্ভব হইয়া উঠিবে না। ভাল খাদ্যে এবং ভাল পোষাকে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বর্দ্ধিত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

মহাপ্রসাদে "ভালমন্দ" বিচার-প্রসঙ্গ।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন—সাধক ভক্ত তো শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদই গ্রহণ করিয়া থাকেন; শ্রীকৃষ্ণে উত্তম দ্রব্য নিবেদন করিলে তাহা তো মহাপ্রসাদই হয়; মহাপ্রসাদরূপে উত্তম বস্তু আহার করিলে কিরূপে প্রত্যবায় হইতে পারে,

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিরূপে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইতে পারে ? মহাপ্রসাদ তো চিন্ময়-বস্তু। ইহার উত্তরে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর একটি উক্তির উল্লেখ করা যায়। সন্ন্যাসের পরে কাটোয়া হইতে প্রভু যখন শান্তিপুরে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর ভিক্ষার জন্য যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন ; মহাপ্রভু মনে করিয়াছিলেন, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছে—সুতরাং সমস্তই মহাপ্রসাদ। কিন্তু প্রভু বলিলেন—"সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ। ইহা খাইলে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ ॥ ২।৩।৬১ ॥" প্রভু অবশ্য জীব-শিক্ষার জন্যই ইহা বলিয়াছেন। প্রভুর এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—উপাদেয় ভোজ্য মহাপ্রসাদ হইলেও সাধকের ইন্দ্রিয়-দমনের অনুকূল নয়। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-গোস্বামীও নানাবিধ উপাদেয় বস্তু গোবর্দ্ধনবিহারী শ্রীগোপালকে অর্পণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু "রাত্রিকালে ঠাকুরের করাইয়া শয়ন। পুরীগোসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন ॥ ২।৫।৯০ ॥" অন্য কোনও উপকরণ তিনি গ্রহণ করিলেন না। পুরী-গোস্বামীর আচরণও সাধক-জীবের শিক্ষার নিমিত্ত। কিন্তু ইহার হেতু কি ? মহাপ্রসাদ-সম্বন্ধেও "ভাল না খাইবে" ব্যবস্থা কেন ? শ্রীল রঘুনাথ দাসও মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছু অনিবেদিত দ্রব্য—আহার করিতেন না। ইহার হেতু বোধ হয় এই। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—মহাপ্রসাদরূপে হইলেও উপাদেয় উপকরণ ভোজন করিলে "কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ ॥" এই উক্তির ধ্বনি এই যে—ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা যাঁহাদের মধ্যে সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত উপাদেয় বস্তু গ্রহণেও তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইতে পারে, "ইতর-রাগ-বিস্মারণ শ্রীকৃষ্ণাধরামৃত" গ্রহণেও তাঁহাদের "ইন্দ্রিয়-বারণ" না হইতে পারে। ইহাতে মহাপ্রসাদের মহিমা খর্ব্বের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা ভক্তির পক্ষে মায়া ও মায়ার প্রভাব—ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যাদি দূরীকরণের শক্তি আছে। ভজনের প্রারম্ভেই এই ভক্তি কৃপা করিয়া সাধকের চিত্তে প্রবেশ করেন (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু চিত্তে প্রবেশমাত্রই চিত্তের সমস্ত মলিনতা তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হয় না—ক্রমশঃ হয় ; প্রথমে রজস্তমঃ, তারপর সত্ব দূরীভূত হয় (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যে পর্য্যন্ত চিত্তে কিছু না কিছু মায়িক গুণ থাকিবে, সে পর্য্যন্তই দেহসুখের বাসনা জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা (৩।৫।৪৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। দেহাবেশ হইতেই দেহসুখের বাসনা জন্মে এবং দেহসুখের বাসনাদি হইতেই অনর্থের উদ্‌গম। মধ্যলীলায় ২।২৩।৫ পয়ারের টীকায় দেখান হইয়াছে, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু (১।৩।২৪-২৫ শ্লোক) বলেন, জাতরতি ভক্তের পক্ষেও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভক্তের চরণে অপরাধ জন্মিবার এবং চিত্তে মুমুক্ষা জন্মিবার এবং কৃষ্ণরতি রত্যাভাসে বা অহংগ্রহোপাসনায় পরিণত হওয়ার আশঙ্কা আছে। জাতপ্রেম ভক্তের অনর্থ-নিবৃত্তি পূর্ণা হইলেও পুনরায় অনর্থোদ্‌গমের সম্ভাবনা থাকে। কেবল শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবা-প্রাপ্তিতেই অনর্থের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইতে পারে। ইহা হইতে অনুমিত হয়—শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবা প্রাপ্তির পূর্ব্বপর্য্যন্ত জাতরতি—এমন কি জাতপ্রেম—ভক্তের চিত্তেও সময় সময় স্বসুখ-বাসনা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে। এই সুখবাসনা ভক্তের অনুষ্ঠিত ভক্তি-অঙ্গেও প্রতিফলিত হইতে পারে। সুখবাসনা মায়ার গুণজাত বলিয়া (৩।৫।৪৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) এই বাসনা যখন ভক্তি-অঙ্গে প্রতিফলিত হইবে, তখন সেই ভক্তিও সাময়িক ভাবে গুণীভূতা হইয়া পড়িতে পারে। এই অবস্থায় ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানও ভক্তির পুষ্টি সাধন না করিয়া দুর্ব্বাসনারই পুষ্টি সাধন করিতে পারে। এইরূপ অনুমানের হেতু এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুই বলিয়াছেন—"কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা ॥ নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহিংসন। লাভ-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥ সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়। স্তব্ধ হঞা মুল শাখা বাড়িতে না পায় ॥ ২।১৯।১৪০-৪২॥"—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানেও অবস্থাবিশেষে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির বাসনাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ঠিক এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদী উপাদেয় বস্তুও অবস্থাবিশেষে সাধকের ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বর্দ্ধিত করিতে পারে। স্বসুখ-বাসনারূপ অনর্থহেতু মহাপ্রসাদের মহিমা সম্যক্ প্রকাশিত হইতে পারে না ; তাই ইহাতে মহাপ্রসাদের মহিমা খর্ব্ব হওয়ার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আকাশ যখন ঘনঘটাচ্ছন্ন থাকে, তখন অনেক সময় সূর্য্য দেখা যায়না। এই অবস্থায় ঘনঘটা সূর্য্যের মহিমা খর্ব্ব করিয়াছে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

বলা যায় না। সূর্য্যের উত্তপ্ত কিরণজালও শৈত্যগুণ-প্রধান চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া শৈত্যগুণ ধারণ করে—চন্দ্র হইতে প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণকেই আমরা চন্দ্রের কিরণ বলিয়া থাকি; এই চন্দ্রকিরণের শীতলতা দেখিয়া যদি তাহার মূল সূর্য্যকিরণকে কেহ শীতল বলিয়া মনে করে, তাহা হইবে ভ্রান্তি এবং তাহাতেই সূর্য্যকিরণ শীতল হইয়া যাইবে না। তদ্রূপ, ভক্তির স্বাভাবিক গতি শ্রীকৃষ্ণের দিকে হইলেও তাহাতে যখন জীবের দেহাভিমুখী মায়া বা মায়িক বাসনাদি প্রতিফলিত হয়, তখন বাসনার ধর্ম্মও সাময়িক ভাবে ভক্তি-অঙ্গে প্রতিফলিত হইতে পারে। ভক্তি তখন তটস্থা হইয়া থাকেন, তটস্থা থাকিয়া গুণীভূতা ভক্তিরূপে সাধকের বাসনা-পূর্ত্তির আনুকূল্য বিধান করেন। ইহাই গৌণীভক্তির স্বরূপ (২।১৯।২২-২৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। সূর্য্যরশ্মি সরল রেখাতেই গমন করে, কিন্তু তাহার অগ্র-ভাগে বক্র কোনও বস্তু ধরিলে বক্র ছায়ার সৃষ্টি হয়; সূর্য্যরশ্মির প্রভাবেই বক্র ছায়ার সৃষ্টি; কিন্তু ছায়া বক্র বলিয়া সূর্য্য-রশ্মির গতিকে বক্র বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবে না। কৃষ্ণাভিমুখী ভক্তির অগ্রভাগে দেহাভিমুখী বাসনাকে ধারণ করিলে বাসনানুরূপ ফলই পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণও তাই বলিয়াছেন—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

বৈষ্ণব কখনও মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তু গ্রহণ করেন না। মহাপ্রসাদ ভোজনই বৈষ্ণবের পক্ষে শাস্ত্রীয় বিধি। মহাপ্রসাদ হইল অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু; চিন্ময় বস্তু অপরিমিত গ্রহণেও দেহাদির কোনওরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিতে পারে না। তথাপি কিন্তু শাস্ত্রে বৈষ্ণবের একটী লক্ষণ বলা হইয়াছে—মিতুভক্ (২।২২।৪৭)। বৈষ্ণব সর্ব্বদা পরিমিত আহার গ্রহণ করিবেন। ইহার হেতু এই। দেহে যতক্ষণ মায়ার গুণ বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ মহাপ্রসাদও পরিমাণের অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে দেহের পীড়া জন্মিতে পারে। তাই মিত-ভোজনের ব্যবস্থা।

অথবা—হেতু অন্যরূপও হইতে পারে। তাহা এই। প্রাকৃত জগতে যে সমস্ত বস্তু আছে, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামেও প্রায় যে সমস্ত বস্তু আছে। পার্থক্য এই যে—প্রাকৃত জগতের বস্তু প্রাকৃত, আর চিন্ময় ভগবদ্ধামের বস্তু চিন্ময়, অপ্রাকৃত। স্বরূপগত এই পার্থক্য সত্ত্বেও তাহাদের স্বাদাদি এক জাতীয়ই। চিনি-মিশ্রী উভয় স্থানেই মিষ্ট; নিম্ব উভয় স্থানেই তিক্ত; তেঁতুল উভয় স্থানেই অম্ল; লঙ্কা উভয় স্থানেই ঝাল। তাহাদের গুণাদিও এক জাতীয় হওয়ারই সম্ভাবনা; তবে অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর গুণাদিতে শক্তি-আদির কোনও এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে যে প্রাকৃত বস্তু উত্তেজক, ভগবানে নিবেদিত হইয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করিলেও তাহা উত্তেজকই থাকিবে। ভগবদ্ধামের চিন্ময় বস্তুর উত্তেজকত্ব পরিকরাদির পক্ষে ভগবৎ-সেবা বাসনার এবং ভগবৎ-সেবারই পুষ্টিবিধান করে; তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনাকে উত্তেজিত করিতে পারে না; যেহেতু, তাঁহাদের আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাসনাই নাই। প্রাকৃত জগতের সাধক-ভক্তের মধ্যে কিঞ্চিৎ দেহাবেশ থাকে বলিয়া চিন্ময় মহাপ্রসাদরূপ উত্তেজক বস্তুও স্থলবিশেষে আত্মেন্দ্রিয়-সুখ-বাসনাকে উত্তেজিত করিতে পারে। এইরূপে, যে বস্তুর অতিভোজনে দেহের গ্লানি জন্মে, দেহাবেশ থাকিলে মহাপ্রসাদরূপে সেই বস্তুর অতিভোজনেও সাধক ভক্তের দেহের গ্লানি জন্মিতে পারে।

উল্লিখিত আলোচনায় মহাপ্রসাদেরও অতিভোজনাদিতে অপকারিতার হেতুরূপে যাহা বলা হইল, তাহা একমাত্র অনুমানমূলক। অতিভোজনাদি যে অপকার-জনক, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন, শাস্ত্রও বলিয়াছেন; সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—মহাপ্রসাদ সম্বন্ধেই যদি "ভাল মন্দ" বিচার করিতে হয়, দেহের পীড়াদির ভয়ে যদি মিত-ভোজনের ব্যবস্থাই দিতে হয়, তাহা হইলে "মহাপ্রসাদে বিশ্বাস" রহিল কোথায়? উত্তর—মহাপ্রসাদে বিশ্বাস অতি উত্তম কথা। যাঁহার মহাপ্রসাদে বাস্তব বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ভক্তসুলভ দৈন্যবশতঃ তিনিও বোধহয় মহাপ্রসাদে নিজের অকপট বিশ্বাসের কথা বিশ্বাস করিবেন না। আরও একটী কথা বিবেচ্য। মহাপ্রসাদে বিশ্বাসের বহিরাবরণের অন্তরালে নিজের ভোগলালসা লুক্কায়িত আছে কিনা,

অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। | ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে ॥ ২৩৫

গৌর কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাহাও বিচার করিয়া দেখা দরকার। অনেক সময়ে সাধুর বেশেও গৃহে চোর প্রবেশ করিতে পারে। জাতপ্রেম ভক্তেরও যখন অনর্থোদ্গমের আশঙ্কা থাকে, তখন আত্মরক্ষার্থ যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বনই বাঞ্ছনীয়। সমস্ত ভোজনই মহাপ্রসাদের মর্য্যাদা রক্ষার একমাত্র পন্থা নহে। কণিকাগ্রহণেও মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে; শ্রীল-হরিদাস ঠাকুর সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন (৩।১১।১৯)।

২৩৫। এই পয়ারে রঘুনাথকে প্রভু ভজনের উপদেশ দিতেছেন। রাগানুগীয়-ভজনের যে বাহ্য ও অন্তর—এই দুইটী অঙ্গ আছে, সেই দুইটী অঙ্গের উপদেশই প্রভু দিতেছেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম-গ্রহণের কথায় বাহ্য-সাধক-দেহের ভজনের উপদেশ এবং ব্রজে রাধাকৃষ্ণের মানসিক-সেবার কথায় অন্তর-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। ২।২২।৮৯-৯০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্রীকৃষ্ণনাম বলিতে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি মুখ্যতঃ ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষরের কথাই বলা হইতেছে; ইহাই কলির তারক-ব্রহ্ম নাম।

কিরূপে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও প্রভু বলিলেন—নিজে অমানী হইয়া এবং অপরের প্রতি মানদ হইয়া শ্রীনাম-গ্রহণ করিতে হইবে। অমানী হইয়া অর্থাৎ কাহারও নিকটে কোনওরূপ সম্মানের প্রত্যাশা না করিয়া; সমাজে যাহারা নিতান্ত হেয়, কিম্বা কোনও কারণে নিতান্ত ঘৃণিত, এমন কি যাহারা সম্পূর্ণরূপে সাধন-ভজনহীন, তাহাদের নিকটেও কোনওরূপ সম্মান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিবে না; কারণ, এইরূপ করিলে সম্মান-প্রাপ্তি-বিষয়ে মনের আবেশ জন্মিতে পারে, তাহাতে ভক্তির বিঘ্ন হইবে। আর, সকলকেই সম্মান করিবে, নিতান্ত হেয়, নিতান্ত নিন্দিতকর্ম্মা ব্যক্তিকেও অন্তরের সহিত সম্মান করিবে, এমন কি শৃগাল-কুক্কুরাদিকে পর্য্যন্ত সম্মান করিবে—কারণ, প্রত্যেকের মধ্যেই অন্তর্য্যামিরূপে শ্রীভগবান্ আছেন—"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান॥ ৩,২০।২০॥" "ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥—চৈ, ভাঃ। অন্ত্য। ৩য় অঃ।" এইরূপ করিতে পারিলেই নিজের সম্বন্ধে হেয়তাজ্ঞান আসিবে, নিজের হেয়তা-জ্ঞান না আসিলে দম্ভমাৎসর্য্যাদি ভক্তির প্রতিকূল ভাবগুলি চিত্ত হইতে দূরীভূত হইবে না—নিষ্কপট-ভজনও সম্ভব হইবে না, ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণও সম্ভব হইবে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, এক কৃষ্ণ-নামেরই যখন এতই গুণ যে,—"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদকম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার॥ অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥ ১।৮।২২-২৪॥"—তখন আর অমানী-মানদ-আদি হওয়ার দরকার কি? "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বাপি" কোনও রকমে একবার কৃষ্ণ-শব্দটী উচ্চারণ করিতে পারিলেই তো হইয়া যায়। উত্তর—একথা সত্য, কিন্তু নিরপরাধ ব্যক্তির পক্ষেই একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই প্রেমোদয় সম্ভব। যে চিত্তে পূর্ব্বসঞ্চিত অপরাধ আছে,—"কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥ ১।৮।২৬॥" অপরাধী ব্যক্তির চিত্ত হইতে অপরাধকে অপসারিত করিবার নিমিত্তই অমানী-মানদ হইয়া, তৃণাদপি সুনীচ হইয়া নামগ্রহণের ব্যবস্থা। অবশ্য রঘুনাথের চিত্তে যে অপরাধ ছিল, তাহা নহে—তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর, তাঁহার সাধনেরই কোনও প্রয়োজন ছিলনা—জীব-শিক্ষার নিমিত্তই তাঁহার সাধন; এবং তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া পরম-করুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু জীব-সাধারণের ভজনাঙ্গের উপদেশই দিতেছেন।

নামকীর্ত্তনের উপলক্ষণে প্রভু বোধ হয় নববিধা সাধন-ভক্তির উপদেশই করিলেন। নব-বিধা সাধনভক্তির মধ্যে নাম-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ, আবার "নববিধাভক্তি পূর্ণ হয় যাহা (নাম-সঙ্কীর্ত্তন) হৈতে। ২।১৫।১০৮॥" তাই নাম-সঙ্কীর্ত্তনকে নববিধা ভক্তির অঙ্গী বলিয়া মনে করা যায় এবং অপর ভক্তি-অঙ্গকে তাহার অঙ্গ মনে করা যায়। অঙ্গীর

এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাইবে বিশেষ ॥ ২৩৬

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (৩২)—
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন ॥ ২৩৭

পুন সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে ॥ ২৩৮

হেনকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সভায় করিল মিলন ॥ ২৩৯

সভা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
সভা লঞা কৈল প্রভু বন্যভোজন ॥ ২৪০

রথযাত্রায় সভা লঞা করিল নর্ত্তন।
দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন ॥ ২৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

উল্লেখেই অঙ্গের উল্লেখ ধ্বনিত হয়। বাহ্য-সাধনে রঘুনাথ যে কেবল নামকীর্ত্তনই করিয়াছেন, আর কিছু যে করেন নাই, তাহা নহে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে এবং স্বরূপদামোদরের আদেশে তিনি শ্রীগিরিধারীর সেবা করিয়াছেন, লীলাবর্ণন করিয়াছেন, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনাদি, ব্রজে-বাসাদি সমস্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানই করিয়াছেন। তাই মনে হয়, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের উপলক্ষণে প্রভু সমস্ত ভক্তি-অঙ্গের উপদেশই করিলেন।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি—অন্তশ্চিন্তিত দেহে সর্ব্বদা ব্রজে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিবে; ইহা অন্তর-সাধন। ২।২২।৯০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩৬। বিশেষ—বিশেস বিবরণ; কিরূপে অমানী-মানদ হওয়া যায়, কি প্রণালীতে মানসিক সেবা করিতে হয়, নামসঙ্কীর্ত্তনের উপলক্ষণে আর কি কি ভজনাঙ্গের কথা বলা হইয়াছে ইত্যাদির বিবরণ।

শ্লো। ৩। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১৭।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২৩৬ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

২৩৮। অন্তরঙ্গ সেবা—অন্তঃ + অঙ্গ = অন্তরঙ্গ। হস্তপদাদি বা দেহ হইল লোকের বাহিরের অঙ্গ বা বহিরঙ্গ; আর চিত্ত হইল ভিতরের অঙ্গ বা অন্তরঙ্গ। চিত্তের যে সেবা, তাহাই হইল অন্তরঙ্গের সেবা, বা অন্তরঙ্গ-সেবা। যাঁহার সেবা করিতে হইবে, তাঁহার চিত্ত জানিয়া, অন্তরের ভাব বুঝিয়া যদি এমন কিছু করা যায়, যাহাতে তাঁহার চিত্তে উল্লাস জন্মিতে পারে, কিম্বা তাঁহার চিত্তস্থিত ভাবের পুষ্টিসাধন হইতে পারে, অথবা তাঁহার চিত্তে দুঃখজনক কোনও ভাব থাকিলে তাহা যাহাতে দূরীভূত হইতে পারে—তাহা হইলেই তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবা হইতে পারে।

রঘুনাথদাস স্বরূপদামোদরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন, ইহাই এই পয়ারার্দ্ধে বলা হইল; তিনি কাহার অন্তরঙ্গ সেবা করিতেন? শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর। প্রভু যখন রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া অস্থির হইয়া পড়িতেন, তখন স্বরূপ-দামোদর তাঁহার অন্তর জানিয়া অন্তরস্থিত ভাবের অনুকূল পদাদি কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন; এই জাতীয় সেবা-কার্য্যে স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে রঘুনাথদাসও যোগ দিতেন। ১।১০।৯০ পয়ার দ্রষ্টব্য।

২৩৯। হেন কালে—যে সময়ে রঘুনাথ প্রভুর উপদেশানুযায়ী ভজন করিতেছিলেন এবং স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে প্রভুর অন্তরঙ্গ-সেবা করিতেছিলেন, সেই সময়ে। **পূর্ব্ববৎ**—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত। **সভায়**—সবায়; সকলকে; সমস্ত গৌড়ীয় ভক্তকে। **করিল মিলন**—সাক্ষাৎ করিলেন; কোনও কোনও গ্রন্থে "কৈল নিমন্ত্রণ" পাঠান্তর আছে।

২৪১। করিল নর্ত্তন—কোনও কোনও গ্রন্থে "করিল কীর্ত্তন" পাঠান্তর আছে।

দেখি রঘুনাথের ইত্যাদি—রথ-যাত্রায় নর্ত্তনাদিতে প্রভুর অলৌকিক ভাব-বিকার এবং মাধুর্য্য-বিকাশ দেখিয়া রঘুনাথদাস বিস্মিত হইলেন।

রঘুনাথদাস যবে সভারে মিলিলা।
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা ॥ ২৪২
শিবানন্দসেন তাঁরে কহে বিবরণ—।
তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাইল দশজন॥২৪৩
তোমাকে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল মোরে।
ঝাঁকরা হৈতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে ॥২৪৪
চারিমাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥ ২৪৫
সেই মনুষ্য শিবানন্দসেনেরে পুছিলা—।
মহাপ্রভুর স্থানে এক বৈরাগী দেখিলা ? ॥ ২৪৬
গোবর্দ্ধনের পুত্র তেঁহো—নাম রঘুনাথ।
তার পরিচয় নীলাচলে আছে তোমার সাথ ?২৪৭
শিবানন্দ কহে—তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে।
পরম বিখ্যাত তেঁহো, কেবা নাহি জানে ?॥২৪৮
স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণসম ॥ ২৪৯
রাত্রিদিন করে তেঁহো নামসঙ্কীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ॥ ২৫০
পরম বৈরাগ্য,—নাহি ভক্ষ্য পরিধান।
যৈছে-তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ ॥ ২৫১
দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে ঠাড়া (খাড়া) হয় আহার-লাগিয়া ॥২৫২
কেহো যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস, কভু করেন চর্ব্বণ ॥ ২৫৩
এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধনস্থানে।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে ॥২৫৪
শুনি তার মাতা-পিতা দুঃখিত হইলা।
পুত্রঠাঞি দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈলা ॥২৫৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৪৩-৪৪। **কহে বিবরণ**—রঘুনাথের অনুসন্ধানে তাঁহার পিতা কি কি করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত শিবানন্দসেন রঘুনাথদাসকে বলিলেন। তিনি বলিলেন—"রঘুনাথ, তোমার পিতা মনে করিয়াছিলেন, তুমি আমাদের সঙ্গেই নীলাচলে যাত্রা করিয়াছ; তাই তিনি দশজন লোক আমার নিকট পাঠাইলেন; তাহাদের সঙ্গে আমার নামে একখানা পত্রও দিয়াছিলেন। তোমাকে যেন ঐ লোকদের সঙ্গে বাড়ীতে ফিরাইয়া পাঠাই, পত্রে ইহাই অনুরোধ ছিল। তাহারা ঝাঁকরা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল; তোমাকে আমাদের সঙ্গে না পাইয়া তাহারা দেশে ফিরিয়া গিয়াছে।"

২৪৫। **চারিমাস রহি**—নীলাচলে চারিমাস থাকিয়া। **শুনি**—নীলাচল হইতে ভক্তগণের দেশে ফিরিয়া আসার সংবাদ শুনিয়া। **মনুষ্য পাঠাইলা**—শিবানন্দের নিকটে লোক পাঠাইলেন, রঘুনাথের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত।

২৪৬। **পুছিল**—জিজ্ঞাসা করিল।

"মহাপ্রভুর স্থানে" হইতে "তোমাদের সাথ" পর্য্যন্ত কয়টী কথা রঘুনাথের পিতার প্রেরিত লোক শিবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

২৫৩। **কভু উপবাস** ইত্যাদি—রঘুনাথ যে দিন কাহারও নিকটে কিছু প্রসাদ পাইতেন, সেইদিন তাহা আহার করিতেন। যেদিন কিছু পাইতেন না, সেই দিন উপবাসই করিতেন। যেদিন প্রসাদান্ন না পাইয়া ছোলা আদি সামান্য কিছু পাইতেন, সেইদিন তাহাই চর্ব্বণ করিয়া খাইতেন—সকল অবস্থাতেই তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের কর্ত্তব্য—ভজন করিতেন।

২৫৪। **গোবর্দ্ধনস্থানে**—রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন দাসের নিকটে।

২৫৫। **দ্রব্য**—খাওয়ার জিনিস, পরিবার কাপড়াদি এবং টাকা-পয়সাদি। **মনুষ্য**—রঘুনাথের পরিচর্য্যার নিমিত্ত লোক।

চারিশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ॥ ২৫৬
শিবানন্দ কহে—তুমি সব যাইতে নারিবা।
আমি যবে যাই তবে সঙ্গেই চলিবা॥ ২৫৭
এবে ঘর যাহ, যবে আমি সব চলিব।
তবে তোমাসভাকারে সঙ্গে লঞা যাব॥ ২৫৮
এই ত প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপূর।
রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে লিখিয়াছে প্রচুর॥ ২৫৯

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (১০।৩,৪)—
আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপানুগো
বৈরাগ্যৈকনিধির্নকস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্॥ ৪
যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যত্রায়মারোপণ-তুল্যকালং
তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যম্॥ ৫

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বাসুদেবদত্তস্য প্রিয়ঃ। শ্রীচৈতন্যস্য কৃপাতিরেকেণ সততমবিরতং স্নিগ্ধঃ উদ্বেগরহিতঃ। নীলাচলে তিষ্ঠতঃ স্থিতিং কুর্ব্বতঃ কস্য জনস্য ন বিদিতঃ ন জ্ঞাতঃ। চক্রবর্ত্তী। ৪

যো রঘুনাথদাসঃ সর্ব্বলোকৈক-মনোভিরুচ্যা হেতুভূতয়া কাচিদনির্ব্বচনীয়া অকৃষ্টপচ্যা সৌভাগ্যভূরিতি সম্বন্ধঃ। সর্ব্বলোকানাং যদেকং মন ঐকমত্যং তেনাভিরুচি স্তয়া সৌভাগ্যবিশেষভূঃ সা। কৃষ্যাদিকং বিনা যত্র শস্যাদ্যুৎপত্তিঃ সা অকৃষ্টপচ্যা। যস্মাং শ্রীরঘুনাথদাসভূবি তস্মিন্ প্রসিদ্ধে শ্রীকৃষ্ণে যঃ প্রেমা স এব শাখী বৃক্ষঃ সমারোপণতুল্যকালং তস্মিন্নেব কালে ফলবান্ ভবতীতি শেষঃ। কিংভূতঃ অতুল্যঃ তুলনারহিতঃ। চক্রবর্ত্তী। ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৫৬। শিবানন্দের ঠাঞি—নীলাচলে যাওয়ার পথের সন্ধান জানিবার নিমিত্ত শিবানন্দের নিকটে পাঠাইলেন।

২৫৯। শ্রীল কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক হইতে পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারসমূহে উল্লিখিত উক্তির যাথার্থ্য দেখাইতেছেন।

শ্লো। ৪। অন্বয়। সুমধুরঃ (সুমধুর-স্বভাব) শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ (বাসুদেবদত্তের প্রিয়পাত্র) আচার্য্যঃ যদুনন্দনঃ (যদুনন্দন আচার্য্য); তচ্ছিষ্যঃ (তাঁহার শিষ্য) ইত্যধিগুণঃ (ইহাতে অধিগতগুণ—বিবিধ গুণের আকর) মাদৃশাং (আমাদের) প্রাণাধিকঃ (প্রাণাধিক) শ্রীচৈতন্য-কৃপাতিরেক-সতত-স্নিগ্ধঃ (শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যধিক কৃপালাভ-হেতু স্নিগ্ধ—উদ্বেগশূন্য) স্বরূপপ্রিয়ঃ (স্বরূপদামোদরের প্রিয়) বৈরাগ্যৈকনিধিঃ (বৈরাগ্যের সাগরতুল্য) রঘুনাথঃ (রঘুনাথ) নীলাচলে (নীলাচলে) তিষ্ঠতঃ (অবস্থানকারী) কস্য (কাহার) ন বিদিতঃ (বিদিত নহে)?

অনুবাদ। মধুর-স্বভাব যদুনন্দন-আচার্য্য বাসুদেবদত্তের প্রিয়পাত্র। তাঁহার (যদুনন্দন-আচার্য্যের) শিষ্য বিবিধ গুণের আকর রঘুনাথদাস আমাদের প্রাণাধিক। যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অত্যধিক কৃপালাভহেতু সতত স্নিগ্ধ (উদ্বেগশূন্য), যিনি স্বরূপদামোদরের প্রিয় এবং যিনি বৈরাগ্যের সাগরতুল্য—সেই রঘুনাথকে জানেনা, এমন লোক নীলাচলে কে আছেন? ৪

শ্লো। ৫। অন্বয়। যঃ (যিনি—যে রঘুনাথদাস) সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা (সকললোকের মনের সাধারণ একমাত্র প্রীতির বিষয় বলিয়া) কাচিৎ (কোনও এক অনির্ব্বচনীয়) অকৃষ্টপচ্যা (অকৃষ্টপচ্যা—কর্ষণাদি ব্যতীতই শস্যোৎপাদনে সমর্থা) সৌভাগ্যভূঃ (সৌভাগ্যভূমির তুল্য হইয়াছেন), যত্র (যাহাতে—যে সৌভাগ্যভূমিতে) অয়ং (এই) তৎপ্রেমশাখী (কৃষ্ণপ্রেমতরু) আরোপণ-তুল্যকালং (রোপণ-সম-কালেই—রোপণমাত্রেই) অতুল্যং (তুলনারহিতভাবে) ফলবান্ (ফলবান্ হইয়া থাকে)।

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল।
কর্ণপূর সেইরূপ শ্লোক বর্ণিল ॥ ২৬০
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে ॥ ২৬১
সেই বিপ্র ভৃত্য চারিশত মুদ্রা লঞা।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া ॥ ২৬২
রঘুনাথ দাস অঙ্গীকার না করিলা।
দ্রব্য লঞা তিন জন তাহাঁই রহিলা ॥ ২৬৩
তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন।
মাসে দুইদিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ২৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবাদ। যে রঘুনাথদাস সকল লোকের মনের সাধারণ প্রীতির বিষয় বলিয়া কোনও এক অনির্ব্বচনীয় অকৃষ্টপচ্য (কর্ষণাদি ব্যতীতই শস্যোৎপাদনে সমর্থ) সৌভাগ্যভূমির তুল্য হইয়াছেন—যে সৌভাগ্যভূমিতে (রঘুনাথদাসে) কৃষ্ণ-প্রেম-তরু রোপণ-সমকালেই অনুপম ফল ধারণ করিয়াছে। ৫

সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা—সর্ব্ব (সমস্ত) লোকের একমনের (একতাপ্রাপ্ত মনসমূহের—সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে) যে অভিরুচি (প্রীতি) তদ্ধেতু; একবাক্যে সকলেই প্রীতির পাত্র মনে করে বলিয়া। **অকৃষ্টপচ্যা**—কর্ষণাদি (চাষ-দেওয়া আদি) দ্বারা যাহাতে ফসল জন্মাইতে হয়, তাহাকে বলে কৃষ্টপচ্যা ভূমি; যাহা কৃষ্টপচ্যা নহে—কর্ষণাদি ব্যতীতই কেবলমাত্র বীজ ফেলিয়া রাখিলেই যাহাতে ফসল জন্মে, তাহাকে বলে অকৃষ্টপচ্যা ভূমি; রঘুনাথদাস ছিলেন ঈদৃশী অকৃষ্টপচ্যা **সৌভাগ্যভূঃ**—সৌভাগ্যভূমির তুল্য; সৌভাগ্যই ফলে যে ভূমিতে, যে ভূমিতে কেবল কৃষ্ণপ্রেমরূপ সৌভাগ্যই জন্মে, তাহাকে সৌভাগ্যভূমি বলা যায়; রঘুনাথদাস ছিলেন এইরূপ এক অপূর্ব্ব অকৃষ্টপচ্যা সৌভাগ্যভূমির তুল্য; সাধারণ কৃষিকার্য্যাদি ব্যতীতই তাহাতে সৌভাগ্যরূপ ফসল ফলিত; তাৎপর্য্য এই যে—কৃষ্ণপ্রেম লাভ করার নিমিত্ত তাঁহাকে সাধন করিতে হয় নাই; প্রেমের বীজ তাঁহার চিত্তে পতিত হওয়া মাত্রেই তাহা ফলবান্ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে—**যত্র**—যে সৌভাগ্যভূমিতে, যে রঘুনাথদাসে **তৎপ্রেমশাখী**—সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-সম্বন্ধে শাখী (কল্পতরু), কৃষ্ণপ্রেমকল্পতরু, **আরোপণতুল্যকালং**—রোপণসময়েই, রোপণমাত্রেই ফলবান্ হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমের বীজটী কি? মহৎকৃপা বা ভগবৎ-কৃপার আশ্রিত ভজনাকাঙ্ক্ষা (২।১৯।১৩৩); রঘুনাথদাস উভয়ের কৃপাই পাইয়াছেন; শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপা এবং স্বরূপদামোদরের কৃপা—উভয়ই রঘুনাথের ভজনাকাঙ্ক্ষাকে তৎক্ষণাৎ ফলবতী করিয়াছে। এইভাবে কৃপাপ্রাপ্তি মাত্রেই যে প্রেমলাভ, ইহা একটী **অতুল্য**—তুলনারহিত ব্যাপার; আর কাহারও ভাগ্যে এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

২৫৯-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই দুই শ্লোক।

"যত্রায়মারোপণতুল্যকালম্"—স্থলে "যস্যাং সমারোপণতুল্যকালম্"-পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়; অর্থ—একই।

২৬০। হিরণ্যদাস-গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত লোকের নিকটে শিবানন্দসেন যাহা বলিয়াছেন, ঠিক তাহাই কবি কর্ণপূর তাঁহার গ্রন্থে শ্লোকাকারে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

২৬১। **বর্ষান্তরে**—অন্য বর্ষে; পরবর্ত্তী বৎসরে। **রঘুনাথের সেবক বিপ্র**—রঘুনাথের পরিচর্য্যার নিমিত্ত তাঁহার পিতা-কর্ত্তৃক প্রেরিত দুইজন সেবক এবং একজন ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ বোধ হয় রঘুনাথের জন্য পাক করিবার উদ্দেশ্যে।

২৬২। **সেই বিপ্র ভৃত্য**—সেই ব্রাহ্মণ এবং সেবকদ্বয়। **চারিশত মুদ্রা**—চারিশত টাকা।

২৬৩। রঘুনাথ পিতৃপ্রেরিত টাকাও গ্রহণ করিলেন না এবং সেবক ও বিপ্রের সেবাও গ্রহণ করিলেন না। টাকা-পয়সাদি লইয়া তাঁহারা তিনজন নীলাচলেই অপেক্ষা করিতে লাগিল, দেশে ফিরিয়া আসিল না।

২৬৪-৬৫। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করাইবার নিমিত্ত রঘুনাথের অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার মত কপর্দ্দকশূন্য লোকের পক্ষে এই ইচ্ছা পূর্ণ করার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না; তিনি

দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ-ভৃত্য-ঠাঞি করে এতেক গ্রহণ॥ ২৬৫
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল।
পাছে নিমন্ত্রণ রঘুনাথ ছাড়ি দিল॥ ২৬৬
মাস-দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিল তবে শচীর নন্দন—॥ ২৬৭
রঘু কেনে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল?।
স্বরূপ কহে—মনে কিছু বিচার করিল॥ ২৬৮
'বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন॥ ২৬৯
মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল॥ ২৭০
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হৈবে এই মূঢ়জন॥' ২৭১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নিজেই যে ভিক্ষা করিয়া খায়েন। এক্ষণে, পিতা কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন দেখিয়া, তিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি প্রতিমাসে দুইদিন করিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলেন; দুইদিনের নিমন্ত্রণে প্রভুর নিমিত্ত যে মহাপ্রসাদ কিনিতে হয়, তাহাতে আটগণ্ডা কড়ি (দুই পয়সারও কম) লাগিত। গোবর্দ্ধনদাসের প্রেরিত ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যের নিকট হইতে রঘুনাথ মাসে আটগণ্ডা কড়ি মাত্র গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু নিজের জন্য একটি কড়িও না।

২৬৬। **এইমত**—মাসে দুইদিন করিয়া। **বর্ষ দুই**—দুই বৎসর। **পাছে**—দুই বৎসর পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করার পরে।

২৬৭। **মাস দুই** ইত্যাদি—দুই বৎসর অতীত হইয়া যাওয়ার পরে যখন দুই মাস অতীত হইয়া গেল, এই দুই মাসের মধ্যে একদিনও যখন প্রভু রঘুনাথের নিমন্ত্রণ পাইলেন না, তখন একদিন প্রভু স্বরূপদামোদরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

২৬৮। "রঘু কেনে" ইত্যাদি—ইহা প্রভুর উক্তি।

স্বরূপ কহে ইত্যাদি—প্রভুর কথা শুনিয়া স্বরূপদামোদর বলিলেন,—"প্রভু, রঘুনাথের মনে একটী বিচার উপস্থিত হওয়ায় নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া দিয়াছে।" বিচারটী পরবর্ত্তী তিন পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

২৬৯-৭১। "বিষয়ীর দ্রব্য" হইতে "এই মূঢ়জন" পর্য্যন্ত তিন পয়ারে রঘুনাথের বিচার। রঘুনাথ ভাবিলেন —"আমি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেছি সত্য, কিন্তু আমি জানি, এই নিমন্ত্রণে প্রভুর মন প্রসন্ন হয় না; কারণ, আমি বিষয়ীর অর্থদ্বারাই প্রভুর নিমিত্ত মহাপ্রসাদ ক্রয় করি। যদিও ইহা আমার পিতার অর্থ, তথাপি ইহাতে প্রভুর প্রীতির সম্ভাবনা নাই; কারণ, আমার পিতা-জ্যেঠা সম্বন্ধে স্বয়ং প্রভুই বলিয়াছেন—তাঁহারা "বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া। সুখ করি মানে বিষয়ের মহাপীড়া॥ ৩।৬।১৯৫॥" তাঁহারা আমার পূজনীয়, আমি তাঁহাদের প্রতি বা তাঁহাদের অর্থের প্রতি কোনওরূপ অশ্রদ্ধা দেখাইতে পারি না সত্য; কিন্তু প্রভু যদি তাতে প্রীত না হয়েন, তাহা হইলে কেবল তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা-বশতঃ তাঁহাদের অর্থে প্রভুর অপ্রীতিকর কার্য্য করিবার আমার কি অধিকার আছে? প্রভুর প্রীতি-বিধানই আমার মুখ্য কর্ম্ম, পিতা-জ্যেঠার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন গৌণকর্ম্ম; তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার হানি-ভয়ে যদি আমি তাঁহাদেরই অর্থে প্রভুর নিমন্ত্রণ করি, তবে প্রভুও তাতে প্রীত হইবেন না; সুতরাং তাতে তাঁহাদেরও অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। ইহা আমার বাহ্যিক শ্রদ্ধা মাত্র, তাঁহাদের যাতে অনিষ্ট না হয়, আর প্রভুরও যাতে অপ্রীতি না হয়, তাহা করাই আমার কর্ত্তব্য, তাহাতেই পিতা-জ্যেঠার প্রতি আমার বাস্তবিক শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে। এই অর্থদ্বারা আর প্রভুর নিমন্ত্রণ করিব না। বিশেষতঃ, প্রভুর নিমন্ত্রণের নিমিত্ত এই অর্থ গ্রহণ করিতে আমার চিত্তেরও প্রসন্নতা জন্মে না, ইহা আমি নিজেই অনুভব করিতেছি। যে কার্য্যে আমার নিজেরই প্রসন্নতা নাই, সেই কার্য্যদ্বারা প্রভুর সেবা করিতে গেলে প্রভুই বা কিরূপে প্রসন্ন হইতে পারেন? এখন দেখিতেছি, এইরূপ নিমন্ত্রণে

এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল—॥ ২৭২
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥ ২৭৩
বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস-নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥ ২৭৪
ইঁহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হৈল, জানিয়া আপনি ছাড়ি দিল॥ ২৭৫
কথোদিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল॥ ২৭৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কেবল আমার প্রতিষ্ঠামাত্রই লাভ হইতেছে—"রঘুনাথ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহাপ্রসাদ দেয়"—লোকের নিকটে এইরূপ একটী সুখ্যাতিমাত্রই আমার লাভ হইতেছে; এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও লাভ দেখিতেছি না। আমি নিতান্তই মূর্খ, নিতান্তই মোহান্ধ; তাই এতদিন এই তথ্যটী বুঝিতে পারি নাই; আর পরম করুণ প্রভুও কেবল আমারই অনুরোধে,—পাছে আমি মনে দুঃখ পাই, ইহা মনে করিয়াই আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছেন; ইহাতে বাস্তবিকই তাঁহার মনে প্রীতি জন্মে না।"

২৭২। স্বরূপদামোদর বলিলেন, "প্রভু, এইরূপ বিচার করিয়া রঘুনাথ তোমার নিমন্ত্রণ ছাড়িয়া দিয়াছে।" শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইলেন, তাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন।

২৭৩। "বিষয়ীর অন্ন" হইতে "আপনি ছাড়ি দিল" পর্য্যন্ত তিন পয়ারে প্রভুর উক্তি। প্রভু বলিলেন—"বিষয়াসক্ত ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিলে চিত্তে মলিনতা জন্মে। মলিনচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি স্ফুরিত হয় না।" বাস্তবিক সত্ত্বোজ্জ্বল চিত্ত ব্যতীত অন্যচিত্তে শুদ্ধসত্ত্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি স্ফুরিত হইতে পারে না।

বিষয়ী—বিষয়াসক্ত ব্যক্তি।

২৭৪। বিষয়ীর অন্নে চিত্ত মিলন হয় কেন, তাহাই প্রভু এই পয়ারে বলিতেছেন।

বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্ত সর্ব্বদাই দম্ভ-অহঙ্কারাদি রজোগুণ-সম্ভূত ভাব-সমূহে পরিপূর্ণ থাকে; তাহাদের চিত্তস্থিত ভাবসমূহ তাহাদের জিনিসেও সংক্রমিত হইয়া ঐ জিনিসকে দূষিত করিয়া ফেলে। সুতরাং ঐ দূষিত জিনিস যিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার চিত্তও মলিন হইয়া পড়ে। আর, বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যাহা কিছু দান করে, তাহাই সাধারণতঃ দম্ভ-অহঙ্কারাদি রজোগুণ-সম্ভূত ভাবের দ্বারা, অন্ততঃ প্রতিষ্ঠার লোভের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই দান করিয়া থাকে; সুতরাং ঐরূপ দানে দাতার চিত্তে রজোগুণোদ্ভূত ভাবের মলিনতা জন্মিয়া থাকে। তাই বলা হইয়াছে, বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে দাতা ও ভোক্তা উভয়ের চিত্তই মলিন হইয়া যায়।

শ্রীশ্রীভক্তমাল-গ্রন্থের ষোড়শ-মালায় শ্রীল রুইদাস ঠাকুরের চরিত্র-বর্ণন-উপলক্ষে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের একটী কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; বিষয়ীর অন্ন গ্রহণের অপকারিতা সম্বন্ধে ঐ কাহিনীটী দ্রষ্টব্য।

রাজস নিমন্ত্রণ—প্রাকৃত-রজোগুণের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া (অর্থাৎ দম্ভ-অহঙ্কারাদি বা প্রতিষ্ঠা-লোভাদিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া) যে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাহাই রাজস-নিমন্ত্রণ। "এই লোকটীকে নিমন্ত্রণ করিলে লোকে আমার প্রশংসা করিবে, অথবা এই লোকটী নিতান্ত দরিদ্র, খাইতে পায় না, আমি ধনী, আমি ইহাকে না খাওয়াইলে কে খাওয়াইবে" ইত্যাদি ভাবের বশীভূত হইয়া যে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাহাই রাজস-নিমন্ত্রণ।

২৭৫। এই পয়ারও প্রভুর উক্তি।

ইহার সঙ্কোচে—ইঁহার (রঘুনাথের) সম্বন্ধে সঙ্কোচ বশতঃ; আমি যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করি, তাহা হইলে রঘুনাথের মনে দুঃখ হইবে, ইহা মনে করিয়া।

নিল—নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

২৭৬। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মহাপ্রভুর বাসায় গোবিন্দের নিকট হইতে পাঁচদিন মাত্র প্রসাদ পাইয়া রঘুনাথ

গোবিন্দ-পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে—।
রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাড়া না হয় সিংহদ্বারে ? ॥ ২৭৭

স্বরূপে কহে—সিংহদ্বারে দুঃখানুভবিয়া।
ছত্রে যাই মাগি খায় মধ্যাহ্নকালে যাঞা ॥ ২৭৮

প্রভু কহে—ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার ॥ ২৭৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আর সেখানে যাইতেন না, রাত্রি দশ দণ্ডের পরে শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইতেন। কিছুকাল এইরূপ দাঁড়াইয়া, রঘুনাথ তাহাও ছাড়িয়া দিলেন; ইহার পর হইতে আর ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইতেন না, ছত্রে যাইয়া মাগিয়া খাইতেন।

ছত্র—সত্র-শব্দের অপভ্রংশ। যেখানে গরীব-দুঃখী-দিগকে অন্ন বিতরণ করা হয়, তাহাকে ছত্র বলে। নীলাচলের ছত্র-সমূহে মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়।

২৭৭। প্রভু গোবিন্দের নিকট শুনিলেন যে, রঘুনাথ ছত্রে মাগিয়া খাইতেছেন। শুনিয়া একদিন স্বরূপদামোদরকে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"সত্যই কি রঘুনাথ এখন আর ভিক্ষার জন্য সিংহদ্বারে দাঁড়ায় না ?"

গোবিন্দের কথা যে প্রভু অবিশ্বাস করিয়াছেন তাহা নহে। তথাপি, রঘুনাথের আচরণ যে সঙ্গতই হইয়াছে, ইহা বলিবার উদ্দেশ্যে বক্তব্য বিষয়টী উত্থাপনের সূচনাস্বরূপেই প্রভু আবার স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

অথবা, রঘুনাথ কি আর মোটেই সিংহদ্বারে দাঁড়ায় না, না কি যে দিন সিংহদ্বারে কিছু মিলে না, সেই দিনই ছত্রে যাইয়া মাগিয়া খায়, ইহা নিশ্চিত-রূপে জানিবার নিমিত্তই প্রভু স্বরূপের নিকটে কথাটীর উত্থাপন করিলেন।

২৭৮। এই পয়ার স্বরূপের উক্তি।

দুঃখানুভবিয়া—দুঃখ অনুভব করিয়া।

প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে স্বরূপ বলিলেন—"ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইলে রঘুনাথের অত্যন্ত দুঃখ হয়; তাই এখন আর সিংহদ্বারে দাঁড়ায় না, মধ্যাহ্ন-সময়ে ছত্রে যাইয়া প্রসাদ মাগিয়া খায়।"

প্রশ্ন হইতে পারে, সিংহদ্বারে রঘুনাথের কিসের জন্য দুঃখ জন্মে ? সকল দিন প্রসাদ মিলে না বলিয়াই কি দুঃখ ? কখনও উপবাসী থাকিতে হয়, কখনও বা শুখ্‌না চানা-আদি চিবাইয়া দিন কাটাইতে হয় বলিয়াই কি দুঃখ ? "কভু উপবাস, কভু করয়ে চর্ব্বণ॥" উত্তর—কভু উপবাস, কভু চর্ব্বণ করিতে হয় বলিয়া রঘুনাথের দুঃখ হয় নাই। সিংহদ্বারে ভিক্ষালাভের নিমিত্ত দাঁড়াইলে মনের একটু চঞ্চলতা আসে বলিয়া এবং তজ্জন্য ভজনের বিঘ্ন হয় বলিয়াই দুঃখ। কিরূপে মনের চঞ্চলতা জন্মে, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে ও সংস্কৃত-উক্তিতে প্রভুই বলিয়াছেন।

২৭৯। সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি—ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকা, বেশ্যার আচরণের তুল্য (বেশ্যার আচরণের মত ঘৃণিত ও পাপজনক নহে; বেশ্যার আচরণের তুল্য চিত্তের চঞ্চলতাজনক)।

বেশ্যা অর্থের লোভে রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া থাকে; উদ্দেশ্য, তাহাকে দেখিয়া তাহার সঙ্গলাভের আশায় কোনও দুশ্চরিত্র লোক তাহার গৃহে আসিবে, তাহাকে কিছু অর্থ দিবে। রাস্তায় কোনও বিলাসী লোককে আসিতে দেখিলে বেশ্যা তাহার প্রতিই দৃষ্টি রাখে, মনে করে, এই লোকটী নিশ্চয়ই আমার গৃহে আসিবে। সে যখন চলিয়া যায়, তখন মনে করে, "লোকটী তো আসিল না; আচ্ছা আর একজন আসিতে পারে।" এইরূপে যত লোককেই বেশ্যাটী দেখিতে পায়, সকলের সম্বন্ধেই তাহার মনে এইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইতে থাকে। ইহাই তাহার চিত্ত-চাঞ্চল্যের হেতু।

ভিক্ষার্থী হইয়া যিনি সিংহদ্বারে দাঁড়ান, তাঁহার চিত্তেও এইরূপ আন্দোলন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সমস্ত দিনের উপবাসের পরে মধ্য-রাত্রিতে যখন কোনও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সিংহদ্বারে দাঁড়ান, তখন কোনও ব্যক্তিকে মন্দির হইতে আসিতে দেখিলে তিনি মনে করিতে পারেন, "এই ভক্তটী আমাকে কিছু প্রসাদ দিতে পারেন"; তিনি যখন

তথাহি—

কিমর্থম্ ?—অয়মাগচ্ছতি, অয়ং দাস্যতি,
অনেন ন দত্তম্, অয়মপরঃ সমেত্যয়ং দাস্যতি,
অনেনাপি ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি ॥ ৬
ইত্যাদি।

ছত্রে যাই যথালাভ উদর-ভরণ।
মনঃকথা নাহি, সুখে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৮০
এত বলি পুন তাঁরে প্রসাদ করিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিল ॥ ২৮১
শঙ্করারণ্য সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তাহাঁ হৈতে সেই শিলা-মালা লঞা গেলা ॥ ২৮২
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধনের শিলা।
দুইবস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥ ২৮৩
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা ॥ ২৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

কিছু না দিয়াই হয়তো চলিয়া গেলেন, তখন ভিক্ষার্থী মনে করিতে পারেন, "ইনি তো দিলেন না; আচ্ছা অপর কেহ অবশ্যই দিবেন।" এইরূপে যত জন আসেন, সকলের সম্বন্ধেই এই জাতীয় আন্দোলন মনের মধ্যে চলিতে থাকে। ইহাতেই চিত্ত-চাঞ্চল্য। আর যতক্ষণ কোনও লোক সম্বন্ধে এইরূপ আন্দোলন মনের মধ্যে চলিতে থাকে, ততক্ষণ একান্তভাবে শ্রীনাম-গ্রহণাদিও সম্ভব হয় না।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অন্বয় সহজ।

অনুবাদ। বেশ্যা দ্বারে দাঁড়াইয়া মনে মনে ভাবে—"এই ব্যক্তি আসিতেছে, এই ব্যক্তি (আমাকে ধন) দান করিবে, এই ব্যক্তি (আমাকে ধন) দান করিল না, এই অপর একজন আসিতেছে, এ-ই (আমাকে ধন) দিবে, এইব্যক্তিও (ধন) দিল না, অন্য একজন আসিবে, সে (আমাকে ধন) দিবে।" ৬

২৭৯-পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

২৮০। এই পয়ারও প্রভুর উক্তি। ছত্রে মাগিয়া খাইতে গেলে মনের মধ্যে এইরূপ আন্দোলন জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। সেখানে গেলে কিছু না কিছু পাওয়া যাইবেই; আর যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাতেই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব উদর-জ্বালা নিবারণ করিয়া মনের সুখে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে পারেন।

মনঃকথা—মনে মনে কথা বলা; "এই ভক্তটী আমাকে কিছু দিতে পারেন; না, ইনি দিলেন না, ঐ যে ভক্তটী আসিতেছেন, উনি হয়ত কিছু দিবেন"—ইত্যাদিরূপ চিন্তাজনিত মানসিক আন্দোলন। ছত্রে এসব মানসিক আন্দোলনের সম্ভাবনা নাই।

২৮১। তাঁরে—রঘুনাথদাসকে। **প্রসাদ করিল**—(প্রভু) অনুগ্রহ করিলেন। কি অনুগ্রহ করিলেন? তাঁহাকে "গোবর্দ্ধনের শিলা ও গুঞ্জামালা" দিলেন। **গোবর্দ্ধনের শিলা**—গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের শিলাখণ্ড; শ্রীগিরিধারী-বিগ্রহ। **গুঞ্জামালা**—গুঞ্জা (কাইচ্ বা কুঁচ) ফলের মালা।

২৮২। গোবর্দ্ধনের শিলা এবং গুঞ্জামালা প্রভু কোথায় পাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন। শঙ্করারণ্য-সরস্বতী শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলেন; আসিবার সময়ে শিলা ও মালা শ্রীবৃন্দাবন হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং প্রভুকে দিয়াছিলেন।

"শঙ্করারণ্য"-স্থলে "শঙ্করানন্দ"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

২৮৩। পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা—গুঞ্জাফল-সমুহকে পাশাপাশি গাঁথিয়া এই মালা তৈয়ার করা হইয়াছিল।

২৮৪। শিলা-মালা লইয়া প্রভু কি করিয়াছিলেন, তাহাই চারি পয়ারে বলা হইতেছে।

দুই অপূর্ব্ব বস্তু—গোবর্দ্ধনের শিলা এবং গুঞ্জামালা।

গোবর্দ্ধনের শিলা কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু লয় শিরে ॥ ২৮৫
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু 'কৃষ্ণ-কলেবর' ॥ ২৮৬

এইমত তিন বৎসর শিলা-মালা ধরিল।
তুষ্ট হঞা শিলা-মালা রঘুনাথে দিল ॥ ২৮৭
প্রভু কহে—সেই শিলা 'কৃষ্ণের বিগ্রহ'।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥ ২৮৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গিরিরাজ-শ্রীগোবর্দ্ধনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অশেষবিধ লীলার মধুময়ী স্মৃতি বিজড়িত। বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং একরূপে শ্রীগোবর্দ্ধন-স্বরূপে পূজোপকরণাদি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। গিরিরাজের তটদেশে সখাগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ-লীলা করিতেন; গোবর্দ্ধনজাত ফল-মূলাদি সখাগণের সঙ্গে আহ্লাদের সহিত ভোজন করিতেন। এইস্থানে সুদৃশ্য ও সুগন্ধি পত্র-পুষ্পাদিদ্বারা সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে কতভাবে সাজাইতেন; নিজেরাও সাজিতেন; সুগন্ধি ফুলের ও গুঞ্জাফলের মালা গাঁথিয়া প্রাণ-কানাইকে পরাইতেন, নিজেরাও পরিতেন। গিরিরাজের সীমান্তস্থিত শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডে সখীমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীভানুনন্দিনীর সহিত নাগরেন্দ্রশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ কতই না মধুর-লীলা করিয়াছেন; গিরিরাজের নির্জ্জন গুহা-প্রদেশে তাঁহারা কত কত রহোলীলা সম্পাদন করিয়াছেন। রসিকেন্দ্র-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজস্থিত পুষ্পোদ্যান হইতে কুসুম-চয়ন করিয়া কতই না মোহনসাজে প্রাণেশ্বরীকে সাজাইয়াছেন; আবার সখীগণ-সমভি-ব্যাহারে প্রাণেশ্বরীও কতই না মোহনসাজে স্বীয় প্রাণবল্লভকে সাজাইয়াছেন—শ্বেত-গুঞ্জামালায় সখীগণ কতই না সাধে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে সাজাইয়াছেন; আবার ব্রজেন্দ্রনন্দনও কতই না সাধে প্রেয়সী-শিরোমণি ভানুনন্দিনীর পীনোন্নত বক্ষঃস্থলে সযত্ন-গ্রথিত রক্ত-গুঞ্জাহার পরাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। এই সমস্ত কারণেই গোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে অতি অপূর্ব্ব বস্তু বলিয়া মনে হইয়াছিল।

স্মরণের কালে—ব্রজলীলা-স্মরণের সময়ে, পূর্ব্ব-লীলা স্মরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেন, আনুষঙ্গিকভাবে সাধক-জীব-সমূহকেও ভজনের আদর্শ দেখাইতেন।

গলে পরে গুঞ্জামালা—লীলা-স্মরণের সময়ে প্রভু গুঞ্জামালা গলায় ধারণ করিতেন—ব্রজলীলার উদ্দীপক বলিয়া।

২৮৫-৬। "গোবর্দ্ধনের শিলা" ইত্যাদি দুই পয়ার।

আর,—গোবর্দ্ধনের শিলাখণ্ডকে অত্যন্ত প্রীতির সহিত প্রভু কখনও হৃদয়ে ধারণ করিতেন, কখনও নেত্রে ধারণ করিতেন, কখনও বা মস্তকে ধারণ করিতেন; আবার কখনও বা নাসাগ্রে ধারণ করিয়া শিলার ঘ্রাণ গ্রহণ করিতেন। এই সময়ে প্রভুর নেত্র হইতে অনবরত প্রেমাশ্রু পতিত হইত, আর সেই অশ্রুতে শিলাখণ্ড সম্যক্‌রূপে ভিজিয়া যাইত। এই শিলাখণ্ডকে প্রভু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই মনে করিতেন, তাই তাঁহার এত প্রীতি। রাধাভাবে ভাবিত প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-কলেবর-সদৃশ এই শিলাখণ্ডকে কোথায় রাখিয়া যে তৃপ্ত হইবেন, তাহা যেন স্থির করিতে পারিতেন না; তাই একবার বুকে, একবার চক্ষুতে, একবার মস্তকে ধারণ করিতেন; কিছুতেই যেন তাঁহার প্রাণের আকুল পিয়াসা মিটিত না।

কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়—মৃগমদ ও নীলোৎপল একত্রে মিশ্রিত করিলে যে অপূর্ব্ব সুগন্ধের উদ্ভব হয়, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ তদপেক্ষাও চমৎকারপ্রদ; এই শিলাখণ্ডে প্রভু সেই চমৎকারপ্রদ সুগন্ধই অনুভব করিতেন। **কৃষ্ণকলেবর**—শ্রীকৃষ্ণের দেহ; শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ।

২৮৭। তুষ্ট হঞা—রঘুনাথের বৈরাগ্যদর্শনে তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া।

২৮৮। আগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম ও শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুলতা। বাস্তবিক এই জাতীয়

এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক-পূজন। | অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ২৮৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্যাকুলতাই সেবার প্রাণ। এইরূপ ব্যাকুলতা না থাকিলে কোনও ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই আশানুরূপ ফল শীঘ্র পাওয়া যায় না—ইহাই প্রভু এস্থলে ভঙ্গীতে জানাইলেন। প্রভু অন্যত্রও বলিয়াছেন "যত্নাগ্রহবিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥ ২।২৪।১৫৫॥"

২৮৯। এই শিলার—গোবর্দ্ধন শিলার। এই শিলাকে শিলামাত্র বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক মাত্র মনে না করিরা সাক্ষাৎ "শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ" মনে করিয়াই পূজা করিতে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ; বিগ্রহে ও শ্রীকৃষ্ণে পার্থক্য নাই। "অরূপবৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রই তাঁহার প্রমাণ।

সাত্ত্বিক পূজন—যে পূজায় রজঃ ও তমোগুণ পূজকের হৃদয়ে স্থান পায় না, তাহাই সাত্ত্বিক পূজা; সাত্ত্বিক পূজায় পূজকের চিত্তে দম্ভ-অহঙ্কারাদির ছায়া পর্য্যন্তও থাকেনা, থাকে কেবল হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত দৈন্য। প্রাকৃত রজস্তমোগুণ সম্যক্‌রূপে দূরীভুত হইলে থাকিবে কেবল প্রাকৃত সত্ত্ব; ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভজনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাকৃত সত্ত্বও দূরীভূত হইয়া যাইবে (২।২৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); তখনই হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইবে; এই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবেই শ্রীকৃষ্ণরূপাদির অনুভব সম্ভব হয়। হ্লাদিনী-সংবিদ্-মিশ্রিত সন্ধিনীর সার অংশের নামই শুদ্ধসত্ত্ব—ইহা অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু।

প্রশ্ন হইতে পারে—সত্ত্ব হইল একটী প্রাকৃত গুণ; সাত্ত্বিকীপূজা হইল গুণময়ী পূজা। গুণময়ী পূজাতে গুণাতীত শ্রীকৃষ্ণের সেবা কিরূপে হইতে পারে? শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রঘুনাথদাসকে গুণময় সাত্ত্বিক পূজনের উপদেশ দিলেন কেন?

উত্তর—ভজনের প্রারম্ভে সাধকের চিত্তে প্রায়শঃই মায়িক তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব গুণ থাকে। তমঃ হইতেছে অন্ধকারময়; ইহার আবরণাত্মিকা শক্তি আছে; কোন্ কার্য্য জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলজনক, কোন্ কার্য্য তাহা নহে—তাহা নির্ণয় করিবার বুদ্ধিকে ইহা আবৃত করিয়া রাখে; সুতরাং তমোগুণাচ্ছাদিত সাধক তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। রজোগুণের চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মাইবার শক্তি আছে। তাই রজোগুণ চিত্তের চঞ্চলতা জন্মায়, কোনও একটী বিষয়ে চিত্তের স্থিরতা জন্মাইতে পারে না। সত্ত্বগুণ কিন্তু উদাসীন; ইহা তমোগুণের ন্যায় চিত্তকে আবৃতও করে না, রজোগুণের ন্যায় চিত্তকে বিবিধ বিষয়ে বিক্ষিপ্তও করে না; তাই সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তি কোনও এক বিষয়ে চিত্তকে স্থির করিয়া রাখিতে পারেন। অধিকন্তু সত্ত্বের স্বচ্ছতাগুণ আছে এবং চিত্তের প্রসন্নতাজনক গুণও আছে। তাই সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তি প্রসন্নচিত্ত হইতে পারেন এবং নিজের পরমতম অভীষ্ট-বস্তুর অনুভবও লাভ করিতে পারেন; অবশ্য এই অনুভব অনাবৃত নহে; স্বচ্ছ কাচের অপর পার্শ্বে স্থিত বস্তুর ন্যায় দর্শকের পক্ষে আবৃত—কাচের অপর পার্শ্বের বস্তু কাচের দ্বারা আবৃত বা ব্যবহিত, সত্ত্বগুণের অপর পার্শ্বের বস্তু থাকে সত্ত্বগুণদ্বারা আবৃত বা ব্যবহিত। অন্য বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া (ইহা করিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণকৃপার উপর নির্ভর করিয়া যত্নপূর্ব্বক; "যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে", এইরূপে অপর সমস্ত বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া) জীবের পরমতম অভীষ্ট বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং তাহাতেই চিত্তের নিষ্ঠা স্থাপনের চেষ্টাপূর্ব্বক প্রসন্ন চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পূজাই হইতেছে—সাত্ত্বিকী পূজা। এইরূপ চেষ্টা যাঁহার থাকে, স্বয়ং ভক্তিরাণীই তাঁহার চিত্তের সত্ত্বগুণকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া রজঃ ও তমঃকে নির্জ্জিত করিবেন এবং পরে সত্ত্বকেও দূরীভুত করিবেন (২।২৩।৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এইরূপে মায়ার তিনটী গুণ অপসারিত হইলে চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইবে।

জীবশিক্ষার উদ্দেশ্যেই রঘুনাথদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু জীবের প্রতি সাত্ত্বিক পূজনের উপদেশ দিয়াছেন। রঘুনাথদাস নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ (৩।৬।৪৬-পয়ারের টীকার শেষাংশ দ্রষ্টব্য); তাঁহার চিত্তে মায়ার কোনও গুণই নাই; তাঁহার চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক; সুতরাং তাঁহার পূজা শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা পূজা।

এক কুজা জল আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥ ২৯০
দুইদিকে দুইপত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥ ২৯১
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥ ২৯২
একবিতস্তি দুই বস্ত্র, পিঁড়ি একখানি।
স্বরূপগোসাঞি দিলেন কুজা আনিবারে পানী॥২৯৩
এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন'। ২৯৪
'প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা'।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা ॥ ২৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরবর্ত্তী পয়ারে সাত্ত্বিক পূজার প্রকার বলা হইয়াছে।

২৯০। এক কুজা জল, আর তুলসীমঞ্জরী, আর শুদ্ধভাব—এই হইল সাত্ত্বিক-পূজার উপকরণ। বাহিরের উপকরণ হইল জল ও তুলসীমঞ্জরী ; আর ভিতরের উপকরণ হইল শুদ্ধভাব ; এই শুদ্ধভাবটীই বোধ হয় মুখ্য উপকরণ ; হৃদয়ে শুদ্ধভাব না থাকিলে কেবল এককুজা জল আর তুলসী মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিলেই সাত্ত্বিকপূজা হইবে না।

কুজা—মাটীর তৈয়ারী এক রকম জলপাত্র।

শুদ্ধভাব—শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী ইচ্ছা ; যাহাতে নিজের ঐহিক বা পারলৌকিক কোনওরূপ সুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও থাকে না, এবং যাহাতে থাকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের বাসনা, তাহাকেই শুদ্ধভাব বলে।

জল ও তুলসীমঞ্জরীর অতিরিক্ত কিছু দিলেই যে সাত্ত্বিক পূজা নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা নহে। চিত্তে যদি শুদ্ধভাব থাকে, প্রেম থাকে, অহৈতুকী ভক্তি থাকে, তাহা হইলে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেও তাহা সাত্ত্বিক-পূজা হইবে। রঘুনাথ কাঙ্গাল, জল-তুলসী ব্যতীত অপর কোনও উপচার তিনি সংগ্রহ করিতে পারিবেন না ; তাই তাঁহাকে কেবল জল-তুলসীর কথাই প্রভু বলিলেন। যিনি জল-তুলসী ব্যতীত অপর উপকরণ অন্যাপেক্ষা না করিয়া অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি তাহা শ্রীকৃষ্ণকে না দিলে বোধ হয় তাঁহার পক্ষে বিত্ত-শাঠ্যই প্রকাশ পাইবে।

২৯১। কিরূপ এবং কয়টি তুলসী-মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ করিতে হইবে, প্রভু তাহাও বলিতেছেন।

দুই দিকে ইত্যাদি—মঞ্জরীটি কোমল হইবে, আর চয়ন করিবার সময় এমনভাবে চয়ন করিবে, যেন ঐ মঞ্জরীর দুই পার্শ্বে দুইটি পাতা থাকে। এইরূপ আটটী মঞ্জরী লইয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ-চরণে নিবেদন করিবে।

কোমল-মঞ্জরী বলাতে বোধ হয় ইহাই বুঝায় যে, যে মঞ্জরী অনেক দিন হইল বাহির হইয়া গিয়াছে, সুতরাং যাহা শক্ত হইয়াছে, কিম্বা যাহা ফুটিয়া গিয়াছে, এরূপ মঞ্জরী দেওয়া তত প্রশস্ত নহে।

২৯২। **শ্রীহস্তে**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিজ হাতে। **এই আজ্ঞা**—সেবা সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত উপদেশ।

২৯৩। রঘুনাথ কাঙ্গাল ; শ্রীগিরিধারী-বিগ্রহকে বসাইবার আসনই বা পাইবেন কোথায়, পরাইবার বস্ত্রই বা পাইবেন কোথায়, আর জল আনিবার কুজাই বা পাইবেন কোথায় ? তাই স্বরূপদামোদর তাঁহাকে ঠাকুরের আসনের নিমিত্ত একখানা পিঁড়ি দিলেন, ঠাকুরকে পরাইবার জন্য একখানা এবং গায়ে দেওয়াইবার জন্য একখানা, এই দুই খানা এক বিঘত পরিমাণ কাপড় দিলেন ; আর জল আনিবার জন্য একটা কুজা দিলেন।

এক বিতস্তি—এক বিঘত ; আধ হাত। **পানী**—জল।

২৯৪। **পূজাকালে** ইত্যাদি—পূজার সময়ে রঘুনাথ শিলা-খণ্ডকে আর শিলারূপে দেখেন না; তিনি দেখেন, ঐ শিলাস্থানে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনই তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত।

২৯৫। প্রেমে ভাসি গেলা—প্রভুর করুণার কথা এবং শ্রীশিলাখণ্ডের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যের কথা ভাবিয়া রঘুনাথ প্রেমে বিহ্বল হইয়া যাইতেন, তাঁহার নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু পতিত হইত, সেই অশ্রুতে সমস্ত বক্ষঃ ভাসিয়া যাইত।

জলতুলসীর সেবায় তাঁর যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয় ॥ ২৯৬
এইমত কথোদিন করেন পূজন।
তবে স্বরূপগোসাঞি তাঁরে কহিল বচন—॥২৯৭
অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম ॥ ২৯৮

তবে অষ্টকৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ তাহা করে সমাধান ॥২৯৯
রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল।
গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল—॥৩০০
শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জমালা দিয়া দিলা রাধিকাচরণে ॥ ৩০১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৯৬। তাঁর—ব্রজেন্দ্র-নন্দনের।

বিশুদ্ধ ভাবের সহিত, প্রেমের সহিত যদি কোনও ভক্ত কেবলমাত্র জল-তুলসী-দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যত সুখী হয়েন, প্রেম-শূন্য স্বসুখ-বাসনা-মলিন চিত্ত লইয়া ষোড়শোপচার দ্বারা কেহ সেবা করিলেও তত সুখী হয়েন না। "নানোপচারকৃত-পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ প্রেম্ণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ। যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্য-পেয়ে॥ পদ্যাবলী। ১৩॥"

ষোড়শোপচার—আসন-স্বাগতে সার্ঘ্যে পাদ্য মাচমনীয়মকম্। মধুপর্কাচমস্নানবসনাভরণানি চ॥ সুগন্ধ-সুমানো ধূপদীপ-নৈবেদ্যবন্দনম্। প্রয়োজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্ত ষোড়শ॥ —আসন, স্বাগত, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, স্নান, বসন, আভরণ, সুগন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দনা—অর্চ্চনায় এই ষোলটী উপচারের নাম ষোড়শোপচার। হ, ভ, বি, ১১।৪৬॥" মতান্তরে—"আসনাবাহনঞ্চৈব পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কম্। স্নানং বাসো ভূষণঞ্চ গন্ধঃ পুষ্পঞ্চ ধূপকঃ॥ প্রদীপশ্চৈব নৈবেদ্যং পুষ্পাঞ্জলিরতঃ পরম্। প্রদক্ষিণং নমস্কারো বিসর্গশ্চৈব ষোড়শ॥ আসন, আবাহন, পাদ্য ও অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও বিসর্জ্জন—এই ষোড়শোপচার। হ, ভ, বি, ১১।৪৯॥" যদি কখনও কোনও উপকরণের অভাব হয়, তাহা হইলে অনায়াসলব্ধ উপকরণ এবং মানস-কল্পিত উপচারের দ্বারা পূজা করিবে। "উক্তানাঞ্চোপচারাণামভাবে ভগবান্ সদা। ভক্তেনার্চ্চ্যো যথালব্ধৈস্তৈরন্তর্ভাবিতৈরপি॥ হ, ভ, বি, ১১।৫৫॥"

২৯৮। অষ্ট কৌড়ির খাজা-সন্দেশ—আটটা কড়ি দিয়া যে খাজা-সন্দেশ কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা।

খাজা-সন্দেশ—খাজা ও সন্দেশ; অথবা একপ্রকার সন্দেশ।

২৯৯। স্বরূপ-আজ্ঞায় ইত্যাদি—স্বরূপদামোদরের আদেশে গোবিন্দই খাজা-সন্দেশ কিনিবার নিমিত্ত রঘুনাথকে প্রত্যহ আটটী কড়ি দিতেন।

৩০০। গোসাঞির—শ্রীমন্মহাপ্রভুর। **অভিপ্রায়**—ইচ্ছা। **গোসাঞির অভিপ্রায়** ইত্যাদি—কি উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহাকে শিলা-গুঞ্জমালা দিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিতে করিতে রঘুনাথ যাহা স্থির করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে।

৩০১। রঘুনাথ মনে করিলেন—"গোবর্দ্ধন-শিলা দিয়া প্রভু আমাকে শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের চরণেই অর্পণ করিলেন; আর গুঞ্জমালা দিয়া প্রভু আমাকে শ্রীরাধিকার চরণেই অর্পণ করিলেন। এ অধমকে শিলা-মালা দেওয়ার প্রভুর ইহাই অভিপ্রায়।" রঘুনাথ মনে করিলেন, ভবিষ্যতে শ্রীগোবর্দ্ধন আশ্রয় করিয়া শ্রীরাধারাণীর কিঙ্করীরূপে যুগল-কিশোরের সেবা করিবার ইঙ্গিতই বোধ হয় প্রভু তাঁহাকে দিলেন। প্রভুর অপ্রকটের পরে তিনি করিয়াছিলেনও তাহাই।

এই পয়ারের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"শ্রীবৃন্দাবনীয়োত্তম-যুগলবস্ত্র-দানেন যুগল-ভজনমেবোপদিষ্টমিতি—শ্রীবৃন্দাবনের উত্তম দুইটি বস্ত্র (যুগলবস্ত্র) দান করিয়া প্রভু যুগল-কিশোরের ভজনই উপদেশ করিলেন।"

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ ॥ ৩০২
অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা ?
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥ ৩০৩

সাড়ে সাত প্রহর যায় যাঁহার স্মরণে।
আহার-নিদ্রা চারিদণ্ড, সেহো নহে কোনদিনে॥৩০৪
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥ ৩০৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩০২। **আনন্দে**—প্রভুর কৃপা এবং শিলা-গুঞ্জমালার কথা ভাবিয়া রঘুনাথের আনন্দ।

কায়মনে সেবিলেন ইত্যাদি—যথাবস্থিত দেহে প্রভুর পরিচর্য্যাদি দ্বারা কায়িকী সেবা করিলেন এবং রাধা-ভাবে ভাবিত হইয়া প্রভু যখন ব্রজের ভাবে বিভোর হইতেন, তখন রঘুনাথ নিজেও ঐ সঙ্গে সঙ্গে অন্তশ্চিন্তিত ব্রজস্বরূপে তাঁহার মানসিকী সেবা করিতেন; আর মনেও সর্ব্বদা প্রভুর সুখকামনা করিতেন; প্রভুর উপদেশানুযায়ী কাজ করিয়াও প্রভুর মনে সুখ উৎপাদন করিতেন।

৩০৩। এই পয়ারে গ্রন্থকার কবিরাজ-গোস্বামী রঘুনাথের নিয়মানুবর্ত্তিতার কথা বলিতেছেন। পাষাণের উপর অঙ্কিত রেখা যেমন কোন সময়েই লোপ পায় না, রঘুনাথের নিয়মও তদ্রূপ কোন সময়েই ভঙ্গ হয় নাই; ভজন-সম্বন্ধে তিনি যে নিয়ম করিয়াছিলেন, সর্ব্বদাই তাহা পালন করিয়াছেন; এক দিনের জন্যও একটী নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই। তাঁহার ভজন-নিয়মের একটা দিগ্‌দর্শন পরবর্ত্তী পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে।

৩০৪। আট প্রহর দিবা-রাত্রির মধ্যে রঘুনাথ সাড়েসাত প্রহরই ভজন করিতেন; আহার এবং নিদ্রার জন্য মাত্র চারিদণ্ড সময় রাখিতেন। ভজনের আবেশে যে দিন তন্ময় হইয়া যাইতেন, সেই দিন আহার-নিদ্রাও হইত না—সেই দিন আহার-নিদ্রার অনুসন্ধানই থাকিত না।

স্মরণে—লীলা-স্মরণে; মানসিক সেবায়।

কোনও কোনও গ্রন্থে "স্মরণের" স্থলে "স্মরণকীর্ত্তনে" এবং "সাড়েসাত" স্থলে "সার্দ্ধসপ্ত" পাঠ আছে।

সেহো নহে কোনদিনে—যে দিন ভজনের আবেশে তন্ময় হইয়া যাইতেন, সেই দিন আহার-নিদ্রাও হইত না।

কোনও কোনও গ্রন্থে এই পয়ারস্থলে নিম্নলিখিত পয়ার পাঠান্তর আছে—

"সাড়েসাত প্রহর শ্রবণ-কীর্ত্তন পূজায় যায়।
যে অর্দ্ধ প্রহর রহে, সেহো বাহ্যবৃত্তি নয় ॥"

রূপ-গুণ-লীলা-কথাদির শ্রবণে, শ্রীনামাদির কীর্ত্তনে এবং শ্রীগিরিধারীর পূজায় সাড়েসাত প্রহর ব্যয় হইত; আর যে চারিদণ্ড সময় বাকী থাকিত, তখনও তাঁহার বাহ্যবৃত্তি থাকিত না; আহারের সময়েও ভজনের আবেশ থাকিত, নিদ্রার সময়েও হয়ত লীলাদির স্বপ্নই দেখিতেন। রঘুনাথ প্রত্যহ একলক্ষ হরিনাম করিতেন, দশ সহস্র বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন, এবং যখন শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনবেলা শ্রীকুণ্ডে অবগাহন স্নান করিতেন। "লক্ষ হরিনাম, দশ সহস্র বৈষ্ণবের প্রণাম। ১।১০।৯৭ ॥ তিন বেলা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান ॥ ১।১০।৯৯ ॥"

৩০৫। এক্ষণে রঘুনাথের তীব্র বৈরাগ্যের কথা গ্রন্থকার বলিতেছেন। রঘুনাথের যে বৈরাগ্য, তাহা শুষ্ক বৈরাগ্য নহে, কেবল বৈরাগ্যের জন্য বৈরাগ্য নহে; কৃষ্ণ-প্রীতির উন্মেষেই তাঁহার দৈহিক সুখ-ভোগের বাসনা দূরীভূত হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার এই বৈরাগ্য—এই বৈরাগ্যে তাঁহার দেহে বা মনে তিনি কোনওরূপ কষ্টও অনুভব করেন নাই, বৈরাগ্য-অভ্যাসের উৎকট চেষ্টায় তাঁহার চিত্তও কঠিন হইয়া যায় নাই। তিনি জোর করিয়া বৈরাগ্যকে আনেন নাই; কৃষ্ণ-প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যই স্বয়ং আসিয়া তাঁহার ভজনের আনুকূল্য বিধান করতঃ তাঁহার সেবা করিয়াছে—তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বৈরাগ্যই স্বীয় সার্থকতা লাভ করিয়াছে। রঘুনাথের বৈরাগ্য একটী অদ্ভুত বস্তু—

ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনু না পরে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন ॥ ৩০৬

প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনাকে কহে নির্ব্বেদ-বচন ॥৩০৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জগতের ত্যাগীদিগের মধ্যে বৈরাগ্যে রঘুনাথের সমকক্ষ আর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার বৈরাগ্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত বৈরাগ্যের বিবরণ পড়িবার পূর্ব্বে পাঠক স্মরণ করিবেন, রঘুনাথের পূর্ব্ব-অবস্থা কিরূপ ছিল, কিভাবে তিনি পূর্ব্বে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। যে সম্পত্তির কেবল রাজস্বের আয় বিশলক্ষ টাকা, যাহার সংস্পৃষ্ট বাণিজ্য-কর-আদির আয় আরও অনেক বেশী ছিল, রঘুনাথ সেই বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন; তাঁহার গৃহেও অপ্সরার তুল্য সুন্দরী ও যুবতী ভার্য্যা ছিলেন।

রসের স্পর্শন—ভোজ্য বস্তু মাত্রেরই মধুরাদি কোনও না কোনও রস আছে; প্রাণ ধারণের নিমিত্ত রঘুনাথ যাহা কিছু আহার করিয়াছেন, তাহাতেও মধুরাদি কোনও না কোনও রস অবশ্যই ছিল। তথাপি যে বলা হইল "জন্মাবধি তাঁহার জিহ্বা কোনও রস স্পর্শ করে নাই," ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জিহ্বার লালসায়, বা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছায় তিনি কোনও দিনই কোনও রস আস্বাদন করেন নাই; "এই জিনিসটী খাইতে বেশ ভাল লাগে"—এইরূপ মনে করিয়া তিনি কোনও দিন কিছু খায়েন নাই; কিম্বা "এই জিনিসটী খাইতে ভাল লাগেনা"—এইরূপ মনে করিয়া কোনও খাওয়ার জিনিসও তিনি ত্যাগ করেন নাই। যখন যাহা পাইয়াছেন, প্রাণরক্ষার জন্য (ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নহে), তখনই তিনি তাহা নিজের প্রয়োজন মত আহার করিয়াছেন।

৩০৬। **ছিণ্ডা**—ছেঁড়া, জীর্ণ। **কানি**—ন্যাকড়া, পুরাতন ছেঁড়া কাপড়। **বসন**—কাপড়। **ছিণ্ডা কানি** ইত্যাদি—নীলাচলে আসার পর হইতে রঘুনাথ কখনও নূতন বা ভাল কাপড় পরেন নাই; লোক-সমাজে চলিতে হয় বলিয়া লজ্জা-নিবারণের প্রয়োজন; তাই ছেঁড়া ন্যাকড়া যখন যাহা পাইতেন, তাহাই পরিতেন; কেহ ভাল কাপড় দিলেও তাহা গ্রহণ করিতেন না। আর শীত-নিবারণের নিমিত্ত ছেঁড়া কাঁথা মাত্র ব্যবহার করিতেন; কম্বলাদি ভাল শীতবস্ত্র কেহ দিলেও তাহা গ্রহণ করিতেন না। এই সকল ছেঁড়া ন্যাকড়া বা কাঁথাও বোধহয় তিনি কাহারও নিকটে চাহিয়া লইতেন না, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কেহ দিলে গ্রহণ করিতেন। অথবা পথে কুড়াইয়া পাইলে লইতেন।

সাবধানে প্রভুর ইত্যাদি—"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে" বলিয়া প্রভু যে আদেশ দিয়াছিলেন, রঘুনাথ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহা পালন করিয়াছিলেন।

৩০৭। **প্রাণরক্ষা লাগি** ইত্যাদি—রঘুনাথ যাহা কিছু খাইতেন, তাহাও কেবল নিজের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত, দেহের সুখের উদ্দেশ্যে নহে; ভজনের নিমিত্ত প্রাণ-রক্ষার প্রয়োজন, তাই তাঁহার আহার। কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তারপর ভজনোপযোগী দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম পাওয়া যায়; এই মনুষ্য-জন্মে যদি ভজন না করা যায়, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে যে আবার ভজনোপযোগী মনুষ্যজন্ম পাওয়া যাইবে, তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই—বৃক্ষ-লতাদি স্থাবর-যোনি লাভও হইতে পারে; তাহা হইলে তো আর ভজন হইবে না। এজন্যই ভজনের উদ্দেশ্যে সাধকেরা প্রাণরক্ষা করিতে চেষ্টা করেন।

রঘুনাথ যাহা কিছু পাইতেন, তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে আহার করিয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করিতেন। আর নিজেকে নির্ব্বেদ-বচন বলিলেন।

নির্ব্বেদ-বচন—'অনাদিকাল হইতেই হতভাগ্য আমি নিজের স্বরূপ ভুলিয়া মায়িক উপাধিকে অঙ্গীকার করিয়া দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিতেছি। দেহের সুখ-দুঃখকেই নিজের সুখ-দুঃখ মনে করিয়া আসিতেছি; দেহের বাসনাকেই নিজের বাসনা বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি—দেহ-সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিয়াই কত কোটি কোটি

তথাহি (ভাঃ ৭।১৫।৪০)—

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধূতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ॥ ৭

প্রসাদভাত পসারির যত না বিকায়।
দুই তিন-দিন হৈলে ভাত সড়ি যায়॥ ৩০৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

নন্বাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য ভিক্ষো রিন্দ্রিয়লৌল্যে কো দোষঃ তত্রাহ আত্মানং পরং ব্রহ্ম চেৎ বিজানীয়াৎ জ্ঞানেন ধূতা নিরস্তা আশয়া বাসনা যস্য তস্য জ্ঞানিনো লৌল্যমেব ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ, আত্মানঞ্চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কামায় শরীরমনুসঞ্চরেদিতি। স্বামী। পরং দেহাৎ পৃথক্‌ভূতম্। চক্রবর্ত্তী। ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

জন্ম অতিবাহিত করিয়াছি। ইন্দ্রিয়ের দাসত্বকেই নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি, কখনও একবার নিজের স্বরূপের দিকে তাকাইয়া দেখি নাই, কখনও একবার নিজের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের কথা ভাবি নাই। এমন হতভাগ্য আমি, এমন মোহান্ধ আমি—এখনও আমার ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব ঘুচিল না, এখনও আমার দেহে-আত্মবুদ্ধি ঘুচিল না, এখনও দেহের রক্ষার জন্য আমাকে আহারের অন্বেষণ করিতে হয়, এখনও দেহের শীতাতপ-নিবারণের জন্য বস্ত্রাদির খোঁজ করিতে হয়; যে দেহের সঙ্গে আমার স্বরূপের কোনও সম্বন্ধই নাই, এখনও আমি তাহার সেবাই করিতেছি—" ইত্যাদি বাক্যই নির্ব্বেদ-বচন। এইরূপ নির্ব্বেদ-বচনের শাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে পরবর্ত্তী "আত্মানং" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ৭। **অন্বয়।** আত্মানং চেৎ (আপনাকে) পরং (দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া) বিজানীয়াৎ (যিনি জানিয়াছেন), জ্ঞানধূতাশয়ঃ (জ্ঞানবলে যাঁহার বাসনা নষ্ট হইয়াছে), [সঃ] (তিনি) কিমর্থং (কি অভিপ্রায়ে) কস্য বা হেতোঃ (কি নিমিত্তই বা) লম্পটঃ (দেহাদিতে আসক্ত হইয়া) দেহং) দেহকে) পুষ্ণাতি (পোষণ করেন)?

অনুবাদ। যে জন আপনাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিয়াছে এবং জ্ঞান দ্বারা যাহার বাসনা বিনষ্ট হইয়াছে, সে জন কি অভিলাষে, কি নিমিত্ত দেহাদিতে আসক্ত হইয়া দেহকে পোষণ করিবেন? অর্থাৎ দেহাদি-প্রতিপালনে তিনি আসক্ত হয়েন না। ৭

৩০৭-পয়ারের প্রমাণ এই শ্লোক।

৩০৮। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রঘুনাথ ছত্রে যাইয়া মাগিয়া খাইতেন। কিছুকাল পরে, তিনি তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। বোধহয়, ইহাতেও পরাপেক্ষা আছে বলিয়াই—ছত্রে প্রসাদ পাইতে হইলে, ছত্রের মালীকদের বা কর্ম্মচারীদের অপেক্ষা রাখিতে হয় বলিয়াই, তিনি ছত্রে যাওয়াও ত্যাগ করিলেন। ইহার পরে কি ভাবে আহার সংগ্রহ করিতেন, তাহা "প্রসাদ ভাত" ইত্যাদি চারি-পয়ারে বলা হইয়াছে।

সকলেই জানেন, পুরীতে আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদান্ন বিক্রয় হয়; দুই তিন দিনের বাসি হইয়া পঁচিয়া গেলে সেই অন্ন আর কেহ কিনে না; তাই দোকানদারগণ তখন ঐ পঁচা প্রসাদান্ন, সিংহদ্বারের বাহিরে গরুর সামনে ফেলিয়া রাখে: গরুগুলি তাহার কিছু খায়, কিছু খায়না। যাহা খায়না, তাহা পড়িয়া থাকে; এইরূপে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে সেই প্রসাদান্নগুলি পঁচিয়া গলিয়া এমন দুর্গন্ধময় হয় যে, গরুগুলিও তাহা খাইতে পারে না। এইরূপে যেগুলি গরুও খাইতে পারেনা, রঘুনাথ সেই গলিত প্রসাদান্নগুলি সংগ্রহ করিয়া ঘরে আনিতেন এবং জল দিয়া ভাল রকমে ধুইয়া উপরের গলিত অংশ ফেলিয়া দিয়া মধ্যের যে শক্ত অন্নাংশ থাকে, তাহাই লবণ দিয়া মাখিয়া খাইতেন। এইরূপ পঁচা প্রসাদান্ন সংগ্রহ করিতে কাহারও অপেক্ষা রাখিতে হয় না, কাহারও কোনওরূপ ক্ষতিও হয় না।

পসারির—দোকানদারের। **সড়ি যায়**—পচিয়া যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে—প্রাকৃত বস্তু জড়, অচেতন; তাহাই পঁচিতে পারে; যাহা চিদ্বস্তু, তাহা পঁচিতে

সিংহদ্বারে গাবী-আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গা গাই খাইতে না পারে॥৩০৯
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্র্যে ঘরে আনি।
ভাত পাখালিয়া পেলে দিয়া বহু পানী॥ ৩১০
ভিতরের দৃঢ় যেই মাজিভাত পায়।
লোণ দিয়া মাখি সেই সব ভাত খায়॥ ৩১১
একদিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল॥ ৩১২
স্বরূপ কহে—ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমাসভায় নাহি দেও, কি তোমার প্রকৃতি ?৩১৩
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিলা।
আরদিন প্রভু আসি তাহাঁ কহিতে লাগিলা॥৩১৪
কাহাঁ বস্তু খাও সভে, আমায় না দেও কেনে ?
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণে॥ ৩১৫
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাথে ত ধরিলা।
তোমার যোগ্য নহে, বলি বলে কাড়ি নিলা॥৩১৬
প্রভু কহে—নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই॥ ৩১৭
এইমত রঘুনাথে বারবার কৃপা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে। ৩১৮
আপন উদ্ধার এই রঘুনাথদাস।
গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥ ৩১৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পারে না। মহাপ্রসাদ হইল চিদ্বস্তু; তাহা পঁচিবেই বা কেন, দুর্গন্ধময়ই বা হইবে কেন? **উত্তর—বস্তুতঃ** মহাপ্রসাদ চিদ্বস্তু; তাহা বিকৃতও হয় না, পঁচেও না, দুর্গন্ধময়ও হয় না। জীবের প্রাকৃত চক্ষুতে চিন্ময় বৃন্দাবনকেও যেমন প্রাকৃত স্থানের মত দেখায়, চিন্ময় ভগবদ্‌বিগ্রহকেও যেমন প্রাকৃত প্রতিমার মত দেখায়, তদ্রূপ চিন্ময় মহাপ্রসাদকেও প্রাকৃত অন্নের ন্যায় পঁচা বলিয়া, দুর্গন্ধময় বলিয়া মায়াবদ্ধ জীবের মনে হয়। নীলবর্ণের চশমা ধারণ করিলে শুভ্র শঙ্খকে বা দুগ্ধকেও যেমন নীলবর্ণ দেখায়, তদ্রূপ। মায়াবদ্ধ জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়েই মায়ার আবরণ আছে; এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া দেহীর বা জীবস্বরূপের যে শক্তি বিকশিত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়ের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া আসে। তাই, সুখস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্য জীবস্বরূপের যে বাসনা, তাহাও জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া প্রাকৃত সুখের বা প্রাকৃত রসের বাসনারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। চিন্ময় মহাপ্রসাদে প্রাকৃত অন্নাদির লক্ষণ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দোষেই পরিলক্ষিত হয়। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী যে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন, প্রাকৃত লোকের দৃষ্টিতেই তাহা পঁচা এবং দুর্গন্ধময়; বস্তুতঃ তাহা পঁচাও নয়, দুর্গন্ধময়ও নয়। তাহার সাক্ষী শ্রীমন্‌মহাপ্রভু; তিনি বলিয়াছেন—এই মহাপ্রসাদ অপূর্ব্ব স্বাদবিশিষ্ট (৩।৬।৩১৭); স্বরূপ-দামোদরও এই প্রসাদকে পরম-লোভনীয় অমৃতস্বরূপ বলিয়াছেন (৩।৬।৩১৩)। ইহাই মহাপ্রসাদের স্বরূপ। আগুন যেমন কখনও নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ঠাণ্ডা হইতে পারে না, চিন্ময় মহাপ্রসাদও নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পঁচিতে বা দুর্গন্ধময় হইতে পারে না।

৩০৯। **সিংহদ্বারে**—শ্রীজগন্নাথ-অঙ্গনের সিংহদ্বারে। **গাবী-আগে**—গরুগুলির সাম্‌নে। **ডারে**—ফেলিয়া দেয়। **সড়া গন্ধে**—পঁচা গন্ধে। **তৈলঙ্গা গাই**—এক জাতীয় গাই।

৩১০। **পাখালিয়া**—প্রক্ষালন করিয়া; ধুইয়া।

পানী—জল।

৩১১। **দৃঢ়**—শক্ত। **মাজিভাত**—ভাতের মধ্যস্থিত অংশ। **লোণ**—লবণ।

৩১২। **স্বরূপ**—স্বরূপ-দামোদর। **করিতে দেখিল**—প্রসাদান্ন ধুইয়া খাইতে রঘুনাথকে স্বরূপ দেখিলেন।

৩১৯। **গৌরাঙ্গস্তবকল্পবৃক্ষ**—শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পতরু-নামক রঘুনাথদাস-লিখিত একখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্থ

তথাহি স্তবাবল্যাং গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরোঃ (১১)—
মহাসম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥ ৮

এই ত কহিল রঘুনাথের মিলন।
যেই ইহা শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥ ৩২০

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২১

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথদাস-মিলনং নাম ষষ্ঠপরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা

কুজনং কুৎসিতজনং পতিতং মাং যো মহাসম্পদ্দাবাৎ সকাশাৎ উদ্ধৃত্য স্বীয়ে স্বরূপে ন্যস্য সমর্প্য মুদিতঃ হৃষ্টঃ সন্ প্রিয়ং উরো গুঞ্জাহারং অপচি গোবর্দ্ধনশিলাং মে মহ্যং দদৌ স গৌরাঙ্গো হৃদয়ে মনসি উদয়ন্ প্রাদুর্ভবন্ মাং মদয়তি হর্ষয়তীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী ৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হইতে একটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে; এই শ্লোকে রঘুনাথ নিজেই তাঁহার প্রতি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপার কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্লো। ৮। অন্বয়। যঃ (যিনি) পতিতং (পতিত) কুজনং (ঘৃণিত কুৎসিৎ-জন) মাম্ অপি (আমাকেও) মহাসম্পদ্দাবাৎ (মহাসম্পত্তিরূপ দাবাগ্নি হইতে) অপি (ও) কৃপয়া (কৃপাবশতঃ) উদ্ধৃত্য (উদ্ধার করিয়া) স্বীয়ে স্বরূপে (নিজের অন্তরঙ্গ স্বরূপগোস্বামীর হস্তে) ন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) মুদিতঃ (আনন্দিত হইয়াছিলেন), প্রিয়ম্ অপি (নিজের অত্যন্ত প্রিয় হইলেও) উরোগুঞ্জাহারং (বক্ষঃস্থলস্থিত গুঞ্জাহার) গোবর্দ্ধনশিলাং চ (এবং গোবর্দ্ধনশিলা) মে (আমাকে) দদৌ (দান করিয়াছিলেন) [সঃ] (সেই) গৌরাঙ্গঃ (শ্রীগৌরাঙ্গ) হৃদয়ে (হৃদয়ে) উদয়ন্ (উদিত হইয়া) মাং (আমাকে) মদয়তি (আনন্দিত করিতেছেন)।

অনুবাদ। যিনি পতিত এবং ঘৃণিত আমাকেও (শ্রীরঘুনাথ দাসকেও) মহাসম্পত্তিরূপ দাবাগ্নি হইতে কৃপাবশতঃ উদ্ধার করিয়া অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় বক্ষঃস্থলস্থিত প্রিয়-গুঞ্জাহার এবং গোবর্দ্ধন-শিলাও আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন। ৮

মহাসম্পদ্দাবাৎ—মহাসম্পৎ (বিপুল বিষয়-সম্পত্তিরূপ) দাব (দাবানল) হইতে। গাছে গাছে ঘর্ষণে বনের মধ্যে আপনা-আপনি যে আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহাকে বলে দাবানল। বিপুল-সম্পত্তিকে দাবানল তুল্য বলা হইয়াছে; তাহার হেতু এই যে, বিপুল-সম্পত্তির অধিকারীকে ঐ সম্পত্তির সংশ্রবে যে উদ্বেগ-অশান্তি ভোগ করিতে হয়, তাহার জ্বালাও দাবানলের জ্বালার ন্যায় তীব্র, অসহ্য। অথবা, যে বনে দাবানল জ্বলিয়া উঠে, সেই বনে যেমন কোনও প্রাণী থাকিতে পারে না বা প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ যে চিত্তে বিপুল-সম্পত্তিসম্বন্ধীয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাদি বিদ্যমান, সেই চিত্তেও শ্রীকৃষ্ণোন্মুখতা থাকিতে বা প্রবেশ করিতে পারে না। আবার, দাবানল যেমন বনের বাহির হইতে আসে না, বনের মধ্যেই যেমন তাহার জন্ম, তদ্রূপ বিপুল-সম্পত্তি-সম্বন্ধীয় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাদিও বাহির হইতে প্রায়ই আসে না, সম্পত্তির সংশ্রব হইতেই তাহার উদ্ভব।

কোনও কোনও গ্রন্থে "ব" স্থলে "র" অর্থাৎ "মহাসম্পদ্দাবাৎ"-স্থলে "মহাসম্পদ্দারাৎ" এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। অর্থ—মহাসম্পৎ (বিপুল বিষয়-সম্পত্তি) এবং দারা (স্ত্রী) হইতে। রঘুনাথদাস বিপুল বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ছিলেন; তাঁহার পরমাসুন্দরী কিশোরী ভার্য্যাও ছিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কৃপা করিয়া এই দুইটী বস্তুর প্রভাব হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই দুইটীর কোনও একটীই জীবকে সংসারে আসক্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ। কিন্তু গৃহে অবস্থান-কালেও রঘুনাথ ছিলেন এই দুইটি বস্তুতে অনাসক্ত। তাঁহার পিতাই বলিয়াছেন—"ইন্দ্রসম

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম। এসব বাঁধিতে নারিলেক যার মন॥ দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে। জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে॥ চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হৈঞাছে ইহাঁরে। চৈতন্যচন্দ্রের বাউল কে রাখিতে পারে॥ ৩।৬।৩৮-৪০॥" অতুল ঐশ্বর্য্য এবং পরমাসুন্দরী পত্নীর সান্নিধ্যে থাকিয়াও রঘুনাথের চিত্ত এই দুইটীর একটীতেও লিপ্ত হয় নাই—ইহা কেবল তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপারই ফল। পরে প্রভুর কৃপাই ঐ দুইটী বস্তুর সান্নিধ্য হইতেও তাঁহাকে সরাইয়া নীলাচলে প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে লইয়া গিয়াছে।

দারা-শব্দ স্বভাবতঃই বহু বচনান্ত। এস্থলে সমাহার-দ্বন্দ্বে একবচন হইয়াছে। মহাসম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং সমাহারঃ। এই উভয় হইতে একই সঙ্গে প্রভু রঘুনাথকে উদ্ধার করিয়াছেন।